দাম : বারো টাকা

# স্বস্তিকা

সেদিনের সংবাদপত্র পথ দেখাতে পারে আজকের মিডিয়াকে
— পৃঃ ৩৫

মোবাইল ফোন নির্গত বিকিরণ থেকে শিশুস্বাস্থ্যে কু-প্রভাব
— পৃঃ ২৪-২৫

৭৪ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ২৩ মে, ২০২২।। ৮ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

## মোবাইল ফোনের ক্ষতিকর দিকগুলি থেকে শিশুদের বাঁচান

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

# স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ।।

৭৪ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৩ মে - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১


## সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ◻ ৫

**ছিঃ, কাঙাল অ্যাকাডেমি! দোষ পায়ের নয়, পা যে চাটে তার** ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

**আমরা সবাই ড্যাং ড্যাং** ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

**আদতে সম্পূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক, বাইরে বাড়তি পালিশ রয়েছে মাত্র** ◻ আন্না এমএম বেত্তিকড় ◻ ৮

**রাহুলের উপলব্ধি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই দিতে পারে কংগ্রেসই** ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

**ভারতের শাসন ফিরে পেতে ব্রিটিশরাজের কাছে দরবার** ◻ সুকল্প চৌধুরী ◻ ১১

**যোগী আদিত্যনাথ বিজেপির এক বিস্ময়কর আবিষ্কার** ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১৩

**রামমোহনের মতবাদকে হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা করাই যায় না** ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ১৫

**মূল্য বৃদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছে কোভিড ও যুদ্ধ** ◻ তারক সাহা ◻ ১৮

**মানুষ হারাতে বসেছে তার কন্ট্রোল রুম** ◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ২৩

**মোবাইল ফোন নির্গত বিকিরণে শিশুস্বাস্থ্যে কুপ্রভাব** ◻ ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য ◻ ২৬

**এপাং ওপাং হাম্বা হাম্বায় বাংলা অ্যাকাডেমির কুর্নিশ** ◻ জাহ্নবী রায় ◻ ২৮

**এক নিঃশব্দ বিপ্লবের দিন ফলহারিণী কালীপূজা** ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

**জন্মশতবর্ষে মানব বন্ধনের তামিল কথা ভাষ্যকার** ◻ কৌশিক রায় ◻ ৩৩

**ব্রজেন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার মূলে ছিল বিজ্ঞানমনস্কতা** ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৪

**সেদিনের সংবাদপত্র পথ দেখাতে পারে আজকের মিডিয়াকে** ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ৩৫

**সুলতান মামুদকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এক বাঙ্গালি** ◻ সন্দীপ চক্রবর্তী ◻ ৪৩

**নতুন শিক্ষানীতি শিশুকে করে তুলবে মুক্তমনা** ◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ৪৫


### নিয়মিত বিভাগ


**চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ রঙ্গম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯**

প্রকাশিত হবে
৩০ মে
২০২২

# স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## খেলনায় বিকৃত শৈশব

প্রকাশিত হবে
৩০ মে
২০২২

বাচ্চাদের খেলনায় বিবর্তন ঘটে গেছে। এখন আর বাচ্চা মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলে না। ছেলেরাও খেলনা ট্রেন, হেলিকপ্টার ও অ্যারোপ্লেন নিয়ে খেলা ভুলে গেছে। তাদের খেলার দুনিয়ায় এখন হি-ম্যানদের দাপট। তাদের হাতে আধুনিক প্রযুক্তির লাইট মেশিনগান, ট্যাংক। পাশাপাশি রয়েছে স্মার্টফোনের বিভিন্ন গেমিং অ্যাপ। সেখানেও সারাক্ষণ গোলা-বারুদের আওয়াজ। প্রতি মুহূর্তের এই 'অ্যাকশান' কি শৈশবকে বিকৃত করে দিচ্ছে? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা এই বিষয় নিয়েই প্রকাশিত হবে। লিখবেন— রাজলক্ষ্মী বসু, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name : **AXIS Bank Ltd.**

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার পাঠক, গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের জানানো হচ্ছে যে, বিশেষ কারণবশত আগামী ৪ জুলাই, ২০২২ সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা'র প্রতি কপির মূল্য ১৬.০০ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭০০.০০ টাকা করা হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হলো, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আশাকরি আপনারা আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

আগামী জুলাই মাস থেকে স্বস্তিকায় দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় পাঠাবেন—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

**Sreemani Market Branch, Kolkata - 700 006**

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## ভ্রম ও বিভ্রম

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শৈশবে বারান্দার রেলিংকে ছাত্র বানাইয়া গুরু-শিষ্য খেলা খেলিতেন। বাস্তবের গুরুমহাশয়ের ন্যায় স্বহস্তে বেত্রদণ্ড লইয়া পড়া ধরিতেন। পড়া বলিতে না পারিলে ছাত্রদিগের পৃষ্ঠে উত্তম-মধ্যম জুটিত। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে মাতাঠাকুরানির স্নেহচ্ছায়া হইতে বঞ্চিত কোনো একখানি পাণ্ডববর্জিতকক্ষে গৃহশিক্ষকের নিকট পড়া বলিতে না পারিবার এবং তৎপরবর্তী মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার এইরূপ পুনর্নির্মাণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই আমোদ অনুভব করিতেন। ইহা ছিল শিশু রবীন্দ্রনাথের ক্রীড়া বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই ঘটনা একটি ধ্রুবসত্যের বলিষ্ঠ প্রমাণ। সেইটি হইল, শিশুমাত্রেই কল্পনাপ্রবণ ও অনুকরণপ্রিয়। গৃহে তাহারা যাহাই দেখিয়া থাকে তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া পিতা-মাতার আচরণ তাহাদের অতি প্রিয় দ্রষ্টব্য বিষয়। কয়েক বৎসর পূর্বেও বালিকাদের পুতুলখেলা ও রান্নাবাটি খেলায় সুচারু গৃহিণীপনার পরিচয় পাওয়া যাইত। বালকেরাও তাহাদের পিতাকে অনুকরণ করিয়া কেহ ব্যবসায়ী, কেহ চিকিৎসক কিংবা কেহ চাকুরিজীবী সাজিয়া গৃহাভ্যন্তরে খেলায় মগ্ন থাকিত।

কিন্তু সেই দিন আর নাই। সময় বদলাইয়াছে। একবিংশ শতকের গোড়ায় মোবাইল ফোন আসিয়া প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শিশুদেরও প্রাণ-মন হরণ করিয়াছে। মোবাইল ফোন যতদিন কথা বলিবার মাধ্যম ছিল ততদিন সমস্যা হয় নাই। কিন্তু যুগধর্ম অনুসরণ করিয়া প্রযুক্তিবিদগণ যদ্যপি একটি কথা বলিবার মাধ্যমের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাইয়া ইহাকে আশ্চর্য প্রদীপে পরিণত করিয়াছেন, শুরু হইয়াছে সমস্যা। আবাল বৃদ্ধ বনিতা মোবাইল ফোনের আধুনিকতম প্রযুক্তি স্মার্ট ফোনে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অধুনা প্রায় প্রতিটি গৃহেই বাবা-মা দুইজনেই চাকুরিজীবী বা পেশাজীবী। শিশুরা পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে বড়ো হয়। তাহার খেলিবার সঙ্গী নাই, কথা বলিবার বন্ধু নাই। রূপকথার গল্প বলিয়া কল্পনার অনুপম জগতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পিতামহ-পিতামহী নাই। এই নিঃসীম একাকিত্বের দোসর হইয়া তাহার আবোলতাবোল জীবনে প্রবেশ করিয়াছে স্মার্টফোন। এক্ষণে ফোনের স্ক্রিনেই তাহার ক্রীড়াঙ্গন, বন্ধুদিগের সহিত গল্পগুজব। স্কুল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে একটি ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের স্ক্রিনে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ও আসিবে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে গৃহশিক্ষক গৃহে আসিয়া পাঠদান করিতেন। অধুনা ছাত্র রানাঘাটের গৃহে বসিয়া অনলাইন টিচিং অ্যাপের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতাটি পাঠ করে। তাহাকে কবিতাটির মর্মোদ্ধার করিতে সাহায্য করিতেছেন যে শিক্ষক, তিনি রহিয়াছেন তাঁহার গৃহে, কলকাতায়। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যোগাযোগ বিদ্যমান, নৈকট্য নহে। মহামারী-পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই চিত্র স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। অনলাইন পরীক্ষার প্রচলন করিয়াছে সরকার। ফলত, স্মার্ট ফোনের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমেই বাড়িতেছে। নির্ভরশীলতা মাত্রাছাড়া হইবার ফলে তাহা পরিণত হইয়াছে আসক্তিতে। বিশেষজ্ঞরা বারংবার বলিয়াছেন এই আসক্তি মঙ্গলজনক নহে। স্মার্টফোন হইতে যে রশ্মি নির্গত হয় তাহা বিশেষ করিয়া শিশুদের মস্তিষ্ক, চক্ষু ও ত্বকের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর। স্মার্টফোন বুকের কাছে থাকিলে তাহার কম্পন হার্টের অসুখ ডাকিয়া আনিতে পারে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে বিশেষ কেহ কর্ণপাত করে নাই।

এই কথা অনস্বীকার্য যে, স্মার্টফোন ব্যতিরেকে আধুনিক পৃথিবী কল্পনা করাও সম্ভব নহে। আগামীদিনে ইহা মানবজীবনের সহিত আরও ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যাইবে। কিন্তু ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। বিশেষ করিয়া শিশুরা যাহাতে শুধুমাত্র সঠিক প্রয়োজনেই ইহার ব্যবহার করে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। ইহার দায়িত্ব অভিভাবকগণের। শিশু কাঁদিতেছে বলিয়া তাহার হাতে স্মার্টফোন তুলিয়া দিলে চলিবে না। শিশু ফোনের বায়না ধরিলে তাহাকে বুঝাইতে হইবে, ইহা খেলনা নহে। নচেৎ এই ভ্রম মানব সমাজকে বিভ্রমের দিকে টানিবে। ফিরিয়া আসিবার পথ থাকিবে না।

## সুভাষিতম্

*ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাপমানে চ কুপ্যতি*

*ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াৎ স বৈ সাধুত্তমঃ স্মৃতঃ।।*

**যিনি সম্মানে গর্বিত হন না, অপমানে ক্রোধিত হন না, ক্রোধিত হলেও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধু।**

# ছিঃ, কাঙাল অ্যাকাডেমি ! দোষ পায়ের নয়, পা যে চাটে তার

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

আড়ালে আবডালে ঠাট্টা করে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে 'বোকা ব্রাত্য' বলা হয়। তিনি আরাবুলের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তুলনা করেন। মহাত্মা গান্ধী আর সর্দার প্যাটেলকে ভুলে গিয়ে দাবি করেন স্বাধীনতার লড়াইয়ে গুজরাটিদের ভূমিকা নেই। কারও ফাঁসি হয়নি। ব্রাত্যবাবু সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। প্যাটেলের প্রতিনিধিরা তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছেন। নিতে লজ্জা পাননি। পুরোনো বামপন্থী। তাই তাঁর 'স্বভাব যায় না ধুলে।' এখন মমতাপন্থী। বাংলা অ্যাকাডেমির প্রথম 'মন্ত্রী চেয়ারম্যান'। নেত্রীর রোষ বাঁচাতে তিনি 'রিট্রিরিভারশিপ' পুরস্কার সৃষ্টি করেছেন। নাহলে লোকে বলত 'ছিঃ ছিঃ। মালিক ম্যাট্রিক ফেল আর কর্মচারী এমএ পাশ।' সাংবাদিক বন্ধু লিখেছেন গুগলে সম্মান খুঁজলেই গোল্ডেন রিট্রিভার কুকুরের মুখ ভেসে উঠছে। মমতাকে সম্মান ব্রাত্যবাবুর জীবনের 'মৃত্যুর পরের অংশ।' বিতর্কিত আমলা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী সোনালি চক্রবর্তী ব্যানার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েই মমতাকে সাম্মানিক 'ডি লিট' দেন। ঝড় ওঠে। কংগ্রেসের ভুলে যাওয়া নেত্রী তা 'ডিলিট' বা মুছে ফেলতে বলেন। লজ্জা পেয়ে মমতা জানান তিনি সম্মানের যোগ্য নন। ১৯৮৫-তে জ্যোতি বসু জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জালিয়াতি ধরে ফেলেন। না হলে পশ্চিমবঙ্গ এতদিনে 'ডঃ মমতা' (পিএইচডি) পেত। মমতার পুরস্কারে অনেকে ক্রুদ্ধ হয়ে মাটিতে ভাত খাচ্ছেন। পদত্যাগ করেছেন।

বামপন্থীদের কিছু ত্যাগের নেই। রাজ্যের মানুষ তাদের পরিত্যাগ করেছে। সোনালিদেবীর ঝড়কে 'সুপার সাইক্লোন' করে দিয়েছেন ব্রাত্যবাবু। কবিতায় 'হাম্বা হাম্বা', ঝপাং ঝপাং', 'ঘেউ ঘেউ', 'ঠ্যাং ব্যাং, 'হাতির ঠ্যাং', 'কোলা ব্যাং', 'হাই বাই', 'রঞ্জনা গঞ্জনা', 'কিউআরএসটি', 'বিস্কুট টি' ইত্যাদি আওয়াজ ব্যবহারের জন্য তিনি মমতাকে 'প্রচেষ্টা পুরস্কার' দিয়েছেন। কবিতা আওয়াজ নির্ভর মমতা প্রমাণ করেছেন। আমার এক পরিচিত এই ধরনের কবিতা লিখতেন। চিকিৎসকরা জানান তিনি দুরারোগ্য 'সিজোফ্রেনিয়া'তে আক্রান্ত। মমতা তা নন। তিনি ১১৩টি বই লিখেছেন। প্রচেষ্টা বিতানে ৯৬৪টি কবিতা লিখেছেন।

গীতাঞ্জলিকে অবচেতনে রেখে মমতার 'কথাঞ্জলি' আমি পড়েছি। একজন ঠাট্টা করলেন "বব ডিলান গান গেয়ে সাহিত্যে নোবেল পেতে পারেন আর মমতা 'প্রাণী জগতের' আওয়াজ দিয়ে কবিতা লিখলেই দোষ।" ব্রাত্য জানিয়েছিলেন রাজ্যের অনেক শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক একসঙ্গে মমতাকে এই পুরস্কার দিয়েছেন। ব্রাত্য বাংলা ভুলে গিয়েছেন। যাবারই কথা। শ্রেষ্ঠ একজনই হয়। অনেকে নয়। তাঁর সঙ্গে সদ্যোজাত (পড়ুন শ্রীজাত), পঙ্কিল (পড়ুন ইন্দ্রনীল সেন), পরাজয় (পড়ুন জয় গোস্বামী), আর অবোধ (পড়ুন সুবোধ সরকার) রয়েছেন। সিবিআই পিছু নেওয়ায় 'কাক' শিল্পী দাঁড়ে উঠেছেন। সদাপ্রসন্ন দাবি করেছেন, বিশ্বকবি বেঁচে থাকলে তিনি নিজে মমতাকে এই পুরস্কার দিতেন। অর্থাৎ বাংলা অ্যাকাডেমির 'বক যথা'রা প্রকৃত রবীন্দ্র প্রতিনিধি। বলতে বাধ্য হচ্ছি 'গুরুদেব মরে গিয়ে বেঁচে গিয়েছেন।'

> মমতা বিরোধী কেউ নোবেল পেয়েছেন? তাহলে? প্রশ্ন শুনে এই রাজ্যের 'ঘোড়ারা হাসছে।' আর আমরা হতবাক!

শুনেছি বাংলা অ্যাকাডেমির নতুন নাম হবে 'কাঙাল অ্যাকাডেমি।' ছোটো থেকেই মমতা কবিতা, গান আর ছবি আঁকার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে পারছেন না। ২০১১-তে শাসক হয়ে চেষ্টা প্রবল হয়। তাই 'চেষ্টা' পুরস্কার। লাগবে তকমা। প্রথমেই চিটফান্ড জালিয়াতির নায়ক সুদীপ্ত সেনকে দিয়ে কোটি টাকায় ছবি কিনিয়েছেন। সুদীপ্তবাবু এখন জেলে। ওটা জলছবি হয়ে গিয়েছে। রোমে রবীন্দ্র সংগীত গেয়েছেন। তার ডিলিট আর এখন বাংলা অ্যাকাডেমি। 'টাইমস' পত্রিকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনবার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্থান দিয়েছে। মমতাকে বিশ্বের ১০০ শক্তিশালী নারীর মধ্যে দু'বার। তবে মোদী সাহিত্য পুরস্কার পাননি। বাঙ্গালি কাঁকড়ার জাত। পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপরায়ণ। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, অমর্ত্য সেন আর বিনায়ক ব্যানার্জির নোবেল নিয়ে কুৎসার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। মজার ব্যাপার, তাঁদের সমালোচকরা কেউ নোবেল পায়নি। মমতা পন্থীরা তাই বলছে, ছিঃ। মমতা বিরোধী কেউ নোবেল পেয়েছেন? তাহলে? প্রশ্ন শুনে এই রাজ্যের 'ঘোড়ারা হাসছে।' আর আমরা হতবাক! □

# আমরা সবাই ড্যাং ড্যাং

প্রিয় দিদিভাই,

লাইনটা চিনতে পারছেন? পারছেন না! আপনারই কবিতার লাইন এটা। ওই যে, যে কবিতাটার শুরুর লাইনটা হলো— এপাং ওপাং ঝপাং।

আপনি হয়তো ছন্দ মেলাতে লিখেছেন কিন্তু দিদি আমি আপনার কবিতার কদর করি এবং এটাই আমার বিশ্বাস যে আপনি ভেবেচিন্তে অথবা একটুও না ভেবেই এই সত্যি কথাটা লিখেছেন। কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন প্রশ্ন যদি আসে তবে আমি ড্যাং ড্যাং করে উত্তর লিখে চলে আসব। এই যে আমি আপনার 'ড্যাং ড্যাং' শব্দ ব্যবহারের উত্তরটা দিয়ে এলাম। মানে নির্দ্বিধায় কোনও উত্তর দিতে পারা, কোনও কাজ করতে পারাই হচ্ছে 'ড্যাং ড্যাং'। আবার কারও সমালোচনাকে পাত্তা না দেওয়াটাও একরকম 'ড্যাং ড্যাং'। যেটা আপনি করছেন। করে থাকেন।

পুরস্কার নিয়েছি বেশ করেছি। আপনার নেতা, মন্ত্রীরা তো বাহ্যি করতে গেলেও বলে 'মাননীয়ার অনুপ্রেরণায়'। বাংলা আকাডেমির কর্তারা মানে ব্রাত্য বসু-সহ আপনার লোকেরা সেই ভাবেই মাননীয়ার অনুপ্রেরণায় মাননীয়াকে সম্মান থুড়ি পুরস্কার দিয়েছে। দিদি আপনি পুরস্কারকে রাজনৈতিক শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। বাম আমলেও পুরস্কার দেওয়ায় চাটুকারিতা, স্বজনপোষণ অভিযোগ ছিল। কিন্তু আপনার বেলায় ওসব সমালোচনার আয়ু তিন দিন। আপনি ড্যাং ড্যাং করেই পুরস্কার বিলিয়ে দিয়েছেন। আর তার জোরেই তো গোটা দেশে আপনার মতো বিনোদন ক্ষেত্রের লোকেদের ধরে ধরে রাজনীতিক বানাতে কেউ পারেনি। সাংসদ হয়ে যান বেগম নুসরত, মিমিরা। বিধায়ক হয়ে যান কাঞ্চন, রাজরা। এও তো দিদি পুরস্কারই।

আর সাহিত্য থেকে সিনেমা সবেতেই পুরস্কার দেন শাসক। আমার তো প্রশ্ন— সরকার কেন পুরস্কার দিতে যাবে? সরকার মানেই যে এক বা একাধিক সমমনস্ক রাজনৈতিক দল। রাজ্য চালানোর দায়িত্ব সরকারের হাতে। সরকারের চোখে আলাদা করে কেউ 'বিশিষ্ট' মানুষ হতে পারেন কি? আপনাকে পুরস্কার দেওয়াটা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকডেমির দায়িত্বপ্রাপ্তদের 'চাটুকারিতা' বলে দেখছেন অনেকে। আপনার কবিতা যাঁদের পছন্দ নয় তাঁরা বলছেন, আকাডেমির বাকি পুরস্কার যেহেতু সাহিত্যকর্মের গুণগত মান বিচারের ভিত্তিতে দেওয়া হয় তাই এই নতুন 'ক্যাটেগরি' ঠিক করা হলো। যেখানে স্বীকৃতি দেওয়া হবে অন্য ক্ষেত্রে কাজ করেও 'নিরলস' সাহিত্য সাধনাকে। অনেকেই বলছেন, নতুন পুরস্কারের প্রথম প্রাপক আপনি নন, বরং আপনাকে পুরস্কৃত করতেই নতুন পুরস্কার।

> এখানেই তো আমার গর্ব। আমার দিদি গলা তুলে বলতে পারেন, 'আমরা সবাই ড্যাং ড্যাং।'

'চাটুকারিতা' বা 'স্বজনপোষণ' নিয়ে অভিযোগ এই রাজ্যে অবশ্য নতুন কিছু নয়। অনেক উদাহরণের মধ্যে আবার বেশি করে উল্লেখযোগ্য বাম জমানা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমিই নয়, কলকাতা-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনেক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ভুললে চলবে না যে বাম জমানায় স্পষ্টতই আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে পরিচালিত হতো রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়। অনিল বিশ্বাস ছিলেন বাঙ্গলার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আসল' উপাচার্য। পুরস্কার নিয়ে বাম আমলে যতই অভিযোগ উঠুক এটা দিদি মানতেই হবে যে তৃণমূল জমানায় বাঙ্গলায় পুরস্কার ও সম্মান প্রদানে রাজনৈতিক উৎসাহ বেড়েছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন পর্বে অনেক বিশিষ্টজন তৃণমূলের কাছাকাছি চলে আসেন। পরে তৃণমূল ক্ষমতায় এসে কেন্দ্রের 'পদ্ম' সম্মানের আদলে 'বঙ্গ' সম্মান চালু হয় বাঙ্গলায়। 'বঙ্গশ্রী', 'বঙ্গভূষণ', 'বঙ্গবিভূষণ' দেওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। কে পাননি তার হিসেব রাখা বেশি সহজ। কিন্তু দিদি আপনি পাত্তা দেননি। যেমন এখনও নিজে পুরস্কার নিতে কুণ্ঠা দেখাননি।

এখানেই তো আমার গর্ব। আমার দিদি গলা তুলে বলতে পারেন, 'আমরা সবাই ড্যাং ড্যাং।' ▯

অতিথি কলম

আন্না এমএম বেত্তিকড়

# আদতে সম্পূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক, বাইরে বাড়তি পালিশ রয়েছে মাত্র

সাম্প্রতিক দক্ষিণ ভারতীয় চলনে তৈরি সিনেমাগুলি একটা সর্বভারতীয় পরিচিতিতো পেয়েইছে, একই সঙ্গে তারা প্রচুর বক্স অফিস সাফল্যও পাচ্ছে। একেবারে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কন্নড় ছায়াছবি কেজিএফ ঃ চ্যাপ্টার টু ছবির অনুরাগীরা নায়ককে একই সঙ্গে ঝড়, বন্যা ও ভগবানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর নায়কও পিছিয়ে নেই। তিনি ছবির এক জায়গায় নিজেকে ভারতের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। অন্য যেকোনো সময়ই এই ধরনের উদ্দাম দাপটকে গড়পড়তা পুরুষকেন্দ্রিক ভারতীয় বাণিজ্যিক সিনেমার চলতি ফর্মূলারই প্রতিফলন বলে ধরা হতো। কিন্তু এই ২০২২ সালে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ ভারতে নির্মিত ছবিটার এই ধরনের ঘোষণা কেবলমাত্র নায়কের উচ্চাকাঙ্ক্ষারই ঈঙ্গিত করে না, একই সঙ্গে শতবর্ষ ধরে চলে আসা হিন্দি মূলধারার চলচ্চিত্রের আধিপত্যকেই চ্যালেঞ্জ জানায়। দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এটি সগর্বে ঘোষিত উপস্থিতি বার্তা।

সিনেমার অভ্যন্তরীণ বাজারটি দেখাশোনা করেন এমন সূত্রের নথিবদ্ধ খবর অনুযায়ী মূলত কন্নড় ভাষায় নির্মিত ছবিটির হিন্দি, মালায়লাম, তামিল ও তেলুগু ভাষায় ডাব্‌ড় সংস্করণগুলি বহু বক্স অফিস রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে, যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটি রেকর্ড। বহুবিধ ভাষায় ডাব করা একই ছবির কেবলমাত্র দেশীয় নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও এরকম নজরকাড়া সাফল্য সর্বকালীন অভাবনীয় ঘটনা।

ইতিপূর্বে দক্ষিণ ভারতের চোরাচালানের ওপর নির্মিত তেলুগু ছবি ‘পুষ্পা দ্য রাইজ’ (২০২১) সেই বছরের মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে সর্বাধিক অর্থনৈতিক সাফল্য পেয়েছিল। উল্লেখ্য, কেজিএফ-টু মুক্তি পাওয়ার ঠিক আগের সপ্তাহে প্রেক্ষাগৃহে আসা তেলুগু ছবি ‘আরআরআর’ সর্বসময়ের ব্লকবাস্টার বলে চিহ্নিত হয়েছিল। এই মধ্যবর্তী সময়ের মূলধারার বলিউড ছবিগুলি কোভিড মহামারীর সময় থেকেই দর্শক টানতে ব্যর্থ হচ্ছিল। গোটা মহামারীর সময় থেকে এই ধারা চালু ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেমন তামিল, তেলুগু, বাংলা ও বম্বের হিন্দি ছবিগুলি প্রতি বছর নিজেদের মধ্যে কে কত সংখ্যক ছবি নির্মাণ করতে পারল সেই নিয়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চালায়। এতদিন বরাবরই হিন্দি মূলধারার ছবিগুলি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দর্শকদের কাছে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে এগিয়ে থেকেছে। এর বেশ কিছু কারণের মধ্যে প্রধান হলো ভাষাগত সুবিধে, যা তুলনামূলকভাবে হিন্দির নিশ্চিত বেশি আর মুম্বাই ও দিল্লির প্রচার মাধ্যমগুলির হিন্দি ছবিকে বাড়তি মিডিয়া প্রচার দেওয়া।

স্থিতাবস্থা (স্ট্যাটাস কিউ) এখন যেমন অবস্থায় আছে, বছর দশক ধরেই তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর মধ্যে প্রথম বড়োসড়ো পরিবর্তন দেখা যায় পরিচালক মণিরত্নমের তামিল ছবিগুলি হিন্দিতে ভাষাগত রূপান্তরের পর উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেতে থাকে। ২০০০ এর দশক থেকে অনেক চলচ্চিত্র

“দাক্ষিণাত্যের চলচ্চিত্রগুলি নিজেদের ভাষায় তো বটেই তাদের হিন্দি সংস্করণগুলিও প্রেক্ষাগৃহে মূল হিন্দিধারার ছবিকে পেছনে ফেলে দিচ্ছে। দুঃখের কথা, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত চলচ্চিত্রের নান্দনিকতায় নির্মিত মালায়ালাম ছবি ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কিচেন’ এবং দলিতদের ওপর জাতপাত নিয়ে তামিল সিনেমায় প্রদর্শিত দুর্দশার বাস্তব চিত্র সংবলিত ছবিগুলির সঙ্গে এদের দুস্তর ফারাক। অথচ করোনা মহামারীর সময় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শিত ঘরানার ছবিগুলি সারা ভারতবাসীর প্রশংসা অর্জন করেছিল।”

প্রযোজক হিন্দি বলয়ের উপর নজর দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যের প্রচলিত ভাষার দিকে নজর দেন। এরপরই রজনীকান্ত অভিনীত চলচ্চিত্রগুলি ভারতব্যাপী যথেষ্ট সাড়া ফেলে দেয়। মাত্র কয়েক বছর আগে পরিচালক এসএস রাজামৌলি তাঁর বিখ্যাত 'বাহুবলী' (দ্য বিগিনিং, ২০১৫) ছবিটির মাধ্যমে একধরনের পথপ্রদর্শকের কাজ করেন। বাহুবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজকরা একই সঙ্গে ছবিটি তামিল ও তেলুগু ভাষায় স্যুট করেন এবং দু'টিই হিন্দি ও মালায়লাম ভাষায় ডাব্ করা সংস্করণের সঙ্গে একইদিনে সারাভারতে মুক্তি পায়। আর এই মুক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেক অঞ্চল থেকে ওজনদার লোকদের দিয়ে প্রচার করানো হয়। যেমন মুম্বাইয়ের ক্ষেত্রে হিন্দি বাজার ধরতে করণ জোহর অগ্রণী ভূমিকা নেন। এছাড়া সারা ভারত জুড়ে ছবিটির অভূতপূর্ব প্রচার শুরু হয় যা প্রায় বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাহুবলীর বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় পৌরাণিক গাথা। কিন্তু যে মহাআড়ম্বরে চোখ ধাঁধানো সেট, স্পেশাল এফেক্ট ও পারিপার্শ্বিক ডিটেলের মাধ্যমে ছবিটিকে তুলে ধরা হয় তা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। এটি চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে প্রায় মিথ হয়ে ওঠে। এরই পরবর্তী 'বাহুবলী-টু' আরও বড়ো পরিসরে তৈরি হয় ও চমকপ্রদ হিট হয়। আজকের পুষ্পা, আরআরআর বা কেজিএফ-টু উল্লেখিত চলচ্চিত্রগুলি থেকে কিছু কিছু অনুকরণ করেছে, যেমন বহুভাষিক ডাব্‌ড্ সংস্করণ ও বিশাল ক্যানভাসে নির্মাণ (এটি প্রত্যক্ষভাবে বাহুবলীর ছায়া)। কিন্তু অবশ্যই অনুকরণ হুবহু ছিল না। যেমন পুষ্পা দক্ষিণ ভারতের বাইরে তেমন মার্কেটিং করা হয়নি। তবুও মহামারীর ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলচ্চিত্র থেকে অভুক্ত থাকা দর্শক খানিকটা নিজ প্রচেষ্টাতেই সিনেমাটিকে খুঁজে বার করে। দীর্ঘদিন ধরে হিন্দি চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাদের প্রাধান্য নিয়ে একধরনের পরিতৃপ্তি বা উন্নাসিকতায় আচ্ছন্ন ছিলেন যা এই ধরনের দক্ষিণী চলচ্চিত্রগুলির উঠে আসার রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বহু হিন্দি পরিচালক কিছুটা চৌর্যবৃত্তি, কিছুটা বাহ্যিক আস্তরণ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দক্ষিণী বিষয়বস্তু হিন্দি ছবিতে ব্যবহার করছিলেন বিশেষ করে যেগুলি সেরাজ্যে অর্থনৈতিক সাফল্য পেয়েছিল। মুম্বাইবাহিনী একটু কম পরিচিত হলিউড ছবির কায়দা করে অনুকরণেও পিছপা ছিলেন না।

এই পটভূমিতে পুষ্পা, আরআরআর বা কেজিএফ-টু'র দর্শকদের মনে টাটকা কিছু নিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্যাকেজ, ছবির নির্মাণের বিশাল ক্যানভাস ও বিশেষ করে প্রযুক্তিগত কুশলতার উচ্চমান বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু ছবিগুলির অন্তর্নিহিত সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সেই বহুচর্চিত উত্তর ভারতীয় বাণিজ্যিক ভাবনার হিন্দি বা অন্য কয়েকটি ভাষায় নির্মিত ছবিরই চর্বিতচর্বণ। দর্শকদের মনে ছবিগুলি সরাসরি একধরনের আগ্রাসী পুরুষকারকেই প্রচার করে। বলতে দ্বিধা নেই ছবিগুলিতে নারী চরিত্ররা অধিকাংশই প্রায় প্রান্তিকতায় থেকেযায়। এমনকী তাদের প্রকৃতিগতভাবে নিন্দিত হতে দেখা যায় বা প্রদর্শিত করা হয়। অনেক সময় অযাচিত অত্যাচারের পাত্র হওয়াও বাদ যায় না। পুষ্পা ছবিতে নায়িকার ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনাও নায়ককে টলাতে পারে না। যতক্ষণ না নায়িকা হন্যে হয়ে তাকে প্রেম নিবেদনে স্বীকৃত হয়। এরপরই নারীটির প্রতি জন্মগত অধিকারের কিছুটা পুরুষালি প্রমাণ রাখতেই তথাকথিত খলনায়ককে আক্রমণ করে। নারীর প্রতি প্রেম শর্তসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় যেখানে তার সম্ভ্রমের কোনো মূল্য থাকে না।

অন্যদিকে কেজিএফ-টু ছবিতে নায়ক এক নারীকে অপহরণ করে এবং সরাসরি তাকে জানায় যে সে তার 'বিনোদনের উপকরণ' মাত্র। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার ওপর অবশ্যম্ভাবী নির্যাতন শুরু হয়। মনে রাখতে হবে এই চলচ্চিত্রের পূর্ববর্তী বাহুবলী-১ ছবিতে অন্যতম প্রধান চরিত্র অবন্তিকা শক্তিমান শিভুড়ু দ্বারা নৃশংসভাবে ধর্ষিতা হয়। খানিকটা নারীর ওপর পুরুষকারের তুমুল আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই পর্দা ছাপিয়ে উঠে আসে। এমন বীভৎস ঘটনার দৃশ্যায়ন কিন্তু নাচ ও গান সহযোগে হয়েছিল। এরপরই অবন্তিকা নায়কের প্রতি আসক্ত হতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ পুরুষসিংহের পরাক্রমই সর্বগ্রাসী। সমালোচক ও অধিকাংশ দর্শকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আরআরআর ছবির নায়কের সীমাহীন লড়াকু চরিত্র-লক্ষণ সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে। তাঁরা ভুলে যান ছবিটি কেমন উদ্দেশ্যগতভাবে জনজাতিদের ইতিহাসকে অবজ্ঞা ও পরিহার করে গেল। এই জনজাতিরা ভারতীয় চলচ্চিত্রে এখনোও স্বল্প প্রদর্শিত ও প্রায় উপেক্ষিত। যেকারণে একেবারে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য জনজাতি চরিত্র প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে উঠে আসা আল্লুরি সীতারামাইয়া রাজু ও কোমারাম ভীমের বীরত্বকে বাস্তবানুগ না দেখিয়ে তাঁদের পৌরাণিক বীরের ধাঁচায় গেঁথে ফেলা হয়।

চলচ্চিত্র জগৎ ও তার অর্থনৈতিক পরিধির সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে দাক্ষিণাত্যের চলচ্চিত্রগুলি নিজেদের ভাষায় তো বটেই তাদের হিন্দি সংস্করণগুলিও প্রেক্ষাগৃহে মূল হিন্দিধারার ছবিকে পেছনে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত চলচ্চিত্রের নান্দনিকতায় নির্মিত মালায়ালাম ছবি 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কিচেন' এবং দলিতদের ওপর জাতপাত নিয়ে তামিল সিনেমায় প্রদর্শিত দুর্দশার বাস্তব চিত্র সংবলিত ছবিগুলির সঙ্গে এদের দুস্তর ফারাক। অথচ করোনা মহামারীর সময় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শিত ঘরানার ছবিগুলি সারা ভারতবাসীর প্রশংসা অর্জন করেছিল।

উপসংহারে বলতে হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহতা রাজনীতির যে ধারা ও সমাজের ওপর তার অপপ্রভাব তা নিয়ে পুষ্পা, আরআরআর, কেজিএফ-টু ছবিগুলি সমস্ত প্রাদেশিক ব্যবধান মিটিয়ে দিয়েছে। তাদের বাহ্যিক চমক, বড়ো মাপের দৃশ্যায়ন ও গল্প বলার স্টাইল দক্ষিণ ভারতের বাইরের দর্শকদের চমকিত করেছে। ছবির বিষয়বস্তু এখানে অবান্তর। তবুও তেজীয়ান বিশালত্বের ক্যানভাস নিয়ে তারা আদি বলিউড চিত্র নির্মাতাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। বলিউড পরিচালকরা সত্যিই এমন চলচ্চিত্রের নতুন বিষয়বস্তুর আকাল বোধ করছেন।

**(লেখক চলচ্চিত্র সমালোচক ও প্রাবন্ধিক)**

# রাহুলের উপলব্ধি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই দিতে পারে কংগ্রেসই

সম্প্রতি উদয়পুরে দলের নব সংকল্প শিবিরে এসে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন, বিজেপির সঙ্গে একমাত্র কংগ্রেসই লড়াই করার ক্ষমতা রাখে। কারণ এই লড়াই মতাদর্শভিত্তিক লড়াই, যা কংগ্রেসের আছে, কিন্তু আঞ্চলিক দলগুলোর নেই। তিনি আরও বলেছেন, আঞ্চলিক দলগুলি নিজস্ব পরিসরের বাইরে বেরিয়ে এই লড়াই দিতে পারবে না।

রাহুল গান্ধীর এই বক্তব্য না বোঝার কোনো কারণ নেই। একথা একশো ভাগ সত্যি যে সর্বভারতীয় একটি দলের সঙ্গে অপর একটি সর্বভারতীয় দলেরই আদর্শগত লড়াইয়ের সামর্থ্য আছে। অন্তত ভারতীয় গণতন্ত্রে তেমনটা হলেই দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোটি রক্ষা পেত। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক দলগুলির সীমাবদ্ধ পরিসর, আঞ্চলিকতা, সর্বভারতীয় মানসিকতা না থাকা ইত্যাদি কারণে তারা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে লড়াই দিতে অক্ষম। রাহুল গান্ধীর এই যুক্তি বোঝা যায়। কিন্তু আজ ভারতীয় রাজনীতির এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে?

নব্বইয়ের দশক অবধি দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা যাবে, কংগ্রেস প্রায় একচেটিয়া দেশের শাসন ক্ষমতা উপভোগ করেছে। কিন্তু কোন কংগ্রেস? ১৯৬৯ সালে দলীয় উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে ইন্দিরা গান্ধীকে কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। দেশে তখন জওহরলাল নেহরুর কন্যা হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর তুমুল জনপ্রিয়তা। কংগ্রেসে যাঁরা তাঁর বিরোধী যেমন মোরারজী দেশাই, কামরাজ প্রমুখ ক্রমশ একঘরে হয়ে পড়লেন, ভোটে লড়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসেরই ৭১-এর নির্বাচনে তুমুল জয়জয়কার হলো। ফলে একপ্রকার একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমশ গ্রাস করলো তাঁকে।

কংগ্রেস নেতা ডিকে বড়ুয়া ইন্দিরা গান্ধীর প্রশস্তি করেছিলেন, ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা বলে। কিন্তু সে সুখ কপালে বেশিদিন সইলো না। পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন ইন্দিরা জরুরি অবস্থা জারি করেন, পরে ক্ষমতাচ্যুত হন। পরে আবার ক্ষমতায় আসীন হলেও সেই একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। আজ যে আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান হয়েছে, তার অধিকাংশই কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস ভেঙে হয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল, মহারাষ্ট্রে এনসিপি ইত্যাদি। আসলে জওহরলাল নেহরু পরিবারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দীর্ঘদিন কংগ্রেসের হয়ে দেশের শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে তাঁরা কংগ্রেস পার্টিকে তো বটেই, এমনকী ভারতবর্ষটাকেও নিজের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে এসেছেন। সাম্প্রতিক সোনিয়া- রাহুলও তার থেকে মুক্ত নন। কিন্তু একথা মানতেই হবে, জওহরলাল-ইন্দিরা-রাজীবের এদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ছিল। সেটা হয়তো সোনিয়ারও কিছুটা আছে, কিন্তু রাহুলের একদমই নেই। তাই কংগ্রেসের আজ এই হতশ্রী অবস্থা। উপর্যুপরি দু'দুটো লোকসভা নির্বাচনে তারা সংসদে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পর্যন্ত পায়নি। জরুরি অবস্থার সময়ও কংগ্রেসের হাল এতটা খারাপ হয়নি, আজ তারা যে পর্যায়ে নেমেছে।

> **রাহুল গান্ধীর এদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে একদমই নেই। তাই কংগ্রেসের আজ এই হতশ্রী অবস্থা। উপর্যুপরি দু'দুটো লোকসভা নির্বাচনে তারা সংসদে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পর্যন্ত পায়নি।**

আর এই পর্যায়ে নেমে আসার পর তাদের মনে হয়েছে বিজেপিকে রোখা আঞ্চলিক দলগুলির কর্ম নয়, আদর্শগত লড়াই একমাত্র কংগ্রেসই দিতে পারবে!

বিজেপি বহুবছর ধরে বলে আসছে, সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সর্বভারতীয় দলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, যাতে সারা দেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব তাতে থাকতে পারে। এতে আঞ্চলিক দলগুলি সংযুক্ত হলে অঞ্চলগত চাওয়াপাওয়া গুরুত্ব পাবে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে লঘু হয়ে যাবে।

কিন্তু দেশের মানুষের অঞ্চলগত বিশেষ চাহিদাকে বিজেপি কোনোদিন অবহেলা করেনি আর করেনি বলেই অটলবিহারী বাজপেয়ী ১৩টি আঞ্চলিক দলের সরকারে দেশের মানুষের অঞ্চলগত চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু দেশের স্বার্থের সঙ্গে আপোশ না করেই। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলেছেন। এই সহজ সরল সত্যটাই কংগ্রেস স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও উপলব্ধি করতে পারেনি। এখন চূড়ান্ত অবস্থা বিপর্যয়ে তাদের উপলব্ধি হয়েছে, সর্বভারতীয় রাজনীতি সর্বভারতীয় দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু তিনি বিজেপির সঙ্গে আদর্শগত লড়াইয়ের যে কথা বলেছেন তাতে বলতেই হয়, আস্তে কন কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো! □

# ভারতের শাসন ফিরে পেতে ব্রিটিশরাজের কাছে দরবার

**সুকল্প চৌধুরী**

জীবনের শুরুর সময় থেকেই অসীম আকাশের নীচে নিজের ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকার অদম্য প্রয়াস থাকে সকলেরই। সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকে ভারত এই অদম্য প্রয়াসের দরুন নিজেদের উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। যা কিনা গোটা বিশ্বের কাছে এক বিস্ময়। যদিও মধ্যযুগ পার করে দীর্ঘ আটশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদেশি বর্বরদের অধীনে ছিল ভারতভূমি। তবে আমাদের দেশের প্রকৃত নাগরিকেরা এখন সাগর সমান প্রত্যাশা নিয়ে নিজেদের আবার সামগ্রিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই অদম্য প্রয়াসে শামিল হয়েছেন। কিন্তু অনেকেই আছে যারা ভারতে বসবাস করেন, এই দেশের নাগরিকত্বের সুবাদে হাজারো সুবিধা ভোগ করছেন কিন্তু তারা কোনোদিনই এবং কখনোই নিজেদের ভারতীয় ভাবেন না। কোনোদিন তারা প্রকৃত ভারতীয়দের এই অদম্য প্রয়াসে শামিল হননি। গোপনে তারা বিষবৃক্ষ রোপণ করে চলেছেন। আর তাদের জন্যই বিভিন্ন সমস্যা দেখা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট দেশের খণ্ডিত স্বাধীনতা কারও কাছে পরম প্রাপ্তি, অনেকের কাছে দয়ার দান, একদল আবার মনে করেন তারা এখনো পরাধীন। এই শেষের দলটিই ভারতের জন্য ক্ষতিকর। দেশের প্রায় প্রতিটি সমস্যার জন্য তারাই দায়ী। প্রতি পদক্ষেপে তারা দাঁত-নখ বার করে রাখে। প্রতি বছর জুন মাস এলে তাদের দাঁত-নখ আরো ধারালো হয়। তাদের মতে জুন মাসের ২৩ তারিখ তাদের কাছে পরাধীনতার দিন। সকলেই জানেন ১৭৫৭ সালের এই দিনে মির্জাফর, রায়দুর্লভরা ব্রিটিশদের সহায়তায় সিরাজ দৌল্লাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। নবাব সিরাজ ফরাসিবাহিনীর সহায়তা পেলেও তার সেনাপতি মিরজাফরদের চক্রান্তের ফলে পরাজিত হয়েছিল। মানতেই হবে পলাশী যুদ্ধর পরবর্তী সময়ে দেশের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, শিল্প-কলা সাহিত্য, আধ্যাত্মিক, যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনকী দেশের প্রতি ভালোবাসার জাগরণের এক নতুন দিশা দেখিয়েছিল। কিন্তু পরাধীনতা কেউ মেনে নিতে পারেননি। তাই হাজারো স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে ধর্মীয় বিভাজনের মধ্যে দিয়ে যে খণ্ডিত দেশ আমরা পেয়েছি তাকে ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ভারতবাসী। দেশ খণ্ডিত হওয়ার পেছনে মুসলমানদের আগ্রাসনের পাশাপাশি আমাদের কিছু 'মহান' দেশনেতার ভূমিকাও কম নয়।

**মুসলমানরা তাদের দাবি মতো আলাদা দেশ পেয়ে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু গোটা ভারতের জন্য স্ফুলিঙ্গ জ্বেলে রাখা ভালো। দাবানল একটি শিখা থেকেই হয়। এজন্য অনেকেই সময়ের অপেক্ষায় আছেন।**

স্বাধীনতার পর সার্বিক পরিস্থিতি সামলে দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে কিন্তু একমাত্র প্রকৃত ভারতীয়রাই শামিল হয়েছেন। কিন্তু দেশে বসবাসকারী সবাই এর শরিক নয়। প্রচলিত মিথ হলো, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যের অস্তমিত হওয়া। এই দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের একটা অংশের বিশ্বাস তাই-ই। মধ্য এশিয়ার অনেক দেশও তাই মনে করে। এই কারণেই তাদের অনেকেই এখনো ২৩ জুন 'প্রেমিক' ও 'দেশপ্রেমিক' সিরাজের মহা গুণগান করে 'পরাধীনতা দিবস' পালন করে। অতীতে বহুবার বিদেশিদের হাতে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়েছে। তারা এই দেশের বিভিন্ন এলাকা দখল করে শাসন করেছে। পরে তারা এই দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছে। কিন্তু দেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা, নর-নারীদের দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া, সীমাহীন নরহত্যা করে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠা, দেবালয় ও প্রাচীন সৌধ ধ্বংস করা, বিশ্ববিদ্যালয় আগুনে ভস্মীভূত করা, জোর করে ধর্মান্তরিত করা--- এককথায় মানবতা বিরোধী যাবতীয় পাপাচার ভারতে ইসলামি আক্রমণের পর থেকেই শুরু হয়েছে। মহম্মদ ঘোরির আক্রমণের সময় থেকেই দেশের চরম অবনতি শুরু হয়। অসংখ্য মন্দির বা সৌধ ধ্বংস করে দু'চারটে কুতুব মিনার বা তাজমহল নির্মাণ করাই শেষ কথা নয়। ইসলামি শাসনকালে সামগ্রিকভাবে

ফঃ ২

দেশের চরম অবনতি হয়েছে দেশের।

ব্রিটিশ শাসন ভারতের কাছে আশীর্বাদ না অভিশাপ তা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। কিন্তু এই নিবন্ধের বিষয় ভিন্ন। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র মানবজাতির কাছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান অনেকটাই বদলে গেছে। ভরেতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত আকার নিয়েছে। এই অবস্থায় 'ছিবড়ে হয়ে যাওয়া' ভারত ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করেছিল ইংরেজরা। ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সঙ্গে দেশভাগের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা শুরু করে ব্রিটিশ শাসকরা। ১৯৪৬ সালের শুরুতে হায়দরাবাদের নিজামের ভাই তথা নাজির জানবির সওকতউল্লা খান, অওধের নবাব আল হাসিম খান, অযোধ্যার নবাবের প্রধানমন্ত্রী খান আমাতুল্লা মির্জা মহম্মদ, মুসলিন লিগের নেতা তথা নবাব সৈয়দ মাহামুদুল নাওয়াজুল হক, মৌলানা আবদুর রসিদ খান, নওদার ভিকার উল মুলুক-সহ এগারো জনের প্রতিনিধির একটি দল বড়লাট ওয়াভেলের কথামতো লন্ডনে গিয়ে রাজা ষষ্ঠ জর্জের সঙ্গে দেখা করে মুসলমানদের হাতে ভারতবর্ষের শাসনভার তুলে দেওয়া দাবি জানায়। কারণ হিসাবে তারা বলে, ব্রিটিশরা মুসলমান শাসকের হাত তেকে ক্ষমতা দখল করেছিল, তাই মুসলমানদের হাতেই শাসনভার তুলে দিতে হবে। এই প্রতিনিধি দলের সকলেই ছিল অতীব ধনী এবং ইংল্যান্ডে শিক্ষিত ও ব্রিটিশ অনুগামী। সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা প্রধানত ইংল্যান্ড, আরব ও ভারতীয় উচ্চবিত্ত ঘরের মহিলাদের বিয়ে করত। জানা যায়, রাজা জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের এক মাসেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৪৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় বার্কিংহাম প্যালেসে রাজা ষষ্ঠ জর্জ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সব মিলিয়ে তাদের জন্য মাত্র ৪০ মিনিট বরাদ্দ ছিল। মুসলিম লিগের দস্তাবেজ অনুসারে জানা যায় রাজা নিজেই এই আবেদনপত্র গ্রহণ করেন কিন্তু কোনো মন্তব্য করেননি। এই আবেদনপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও পাঠাননি রাজা। ফলে এক রকম বাজে কাগজের ঝুড়িতে পড়ে থাকে মুসলমান নেতাদের শাসনভার গ্রহণের সাধের দাবিপত্র।

এখানেই থেমে থাকেনি মুসলমান নেতাদের পুনরায় ভারত শাসনের ইচ্ছা। পরের বছর জানুয়ারি মাসে আরও একবার এই চেষ্টা হয়। এবারের প্রতিনিধি দলে আরও কয়েকজন উচ্চবিত্ত মুসলমান যোগ দেয়। এই প্রতিনিধি দলের তালিকায় নাম তাকলেও জিন্না যাননি। এবার ইংল্যান্ডের রাজা দেখা না করলেও তাঁর ভাই ডিউক অব নাটিংহ্যাম জনসন স্যামুয়েল দেখা করেন। এবারের আবেদন পার্লামেন্টে পাঠানো হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতের গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন ও র‍্যাডক্লিফেরে উপর বিষয়টি দেখার দায়িত্ব দেয়। কিন্তু তাঁরা এই আবেদনে গুরুত্ব দেননি। কারণ ততদিনে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে।

ভারতের শাসনভার মুসলমানদের হাতে দেওয়ার আবেদনের বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। প্রতি বছর ২৩ জুনের আগে ব্রিটিশরাজের 'বিশ্বস্ত প্রজারা' এই আবেদন পাঠিয়ে চলেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্রিটিশ রাজদরবারে রাজপ্রতিনিধির কারও হাতে এই আবেদন জমা দেওয়ার প্রথা ছিল। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। তবে প্রতিবার জুন মাসে না হলেও এর কাছাকাছি সময়টাতেই ইংল্যান্ডে যেতেন মুসলমান নেতারা। পরবর্তী সময়ে ইসলামি সংগঠনের পক্ষ থেকে মিলিতভাবে এই আবেদন দেওয়া হতো। ১৯৬২ সাল থেকে দেশ থেকেই এই আবেদন পাঠানো হতো। কিন্তু ১৯৭৭ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশ থেকে আবেদন পাঠানো বন্ধ করে দেন। তাই আবার ইংল্যান্ডে গিয়ে আবেদন দেওয়া শুরু হয়। সাধারণভাবে টুরিস্ট বা শিক্ষা ভিসা নিয়ে যায় তারা। এই কাজে সহায়তা করে প্রধানত বাংলাদেশি ও ভারতীয় প্রবাসী মুসলমানেরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান এবং বর্তমানে টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক মহম্মদ রশিদ আলি চৌধুরী মনে করেন, এই ধরনের আবেদন প্রদানের প্রসঙ্গিকতা এখনো আছে। একটা সময় তিনিও এই বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজেও চারবার ব্রিটিশ রাজপ্রনিধির সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর মতে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে দুই বাঙ্গলাতেই আবেগ আছে। কিন্তু ইতিহাস বলে, পারস্য থেকে আগত সিরাজের দাদু আলিবর্দি খাঁ কোনোমতেই ভারতীয় ছিলেন না। দেশপ্রেমিক তো নয়ই। সিরাজও তাই। সিরাজের কম বয়সি বাঙ্গালি হিন্দু নারী লোলুপতার কতা সকলের জানা। নবাব পরিবারের কেউ একবর্ণ বাংলা জানতো না। অধ্যাপক রশিদ মনে করেন, সিরাজের বিষয়টি বাদ দিলেও 'মুসলমানের হাত থেকে ব্রিটিশরা ক্ষমতা নিয়েছিল, তাই তাদের হাতেই ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে' এমনটা ভাবা অনেকের কাছে নিরর্থক মনে হলেও কিন্তু তা বাস্তব। তার মতে, মুসলমানরা তাদের দাবি মতো আলাদা দেশ পেয়ে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু গোটা ভারতের জন্য স্ফুলিঙ্গ জ্বেলে রাখা ভালো। দাবানল একটি শিখা থেকেই হয়। এজন্য অনেকেই সময়ের অপেক্ষায় আছেন।

বিশেষ একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১১ জুন ইসলামি মজহবি সংগঠনের চারজন এবং সামাজিক সংগঠনের ছ'জন কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে ইংল্যান্ড গিয়েছে। সকলেই টুরিস্ট ভিসায় গিয়েছে। এদের মধ্যে নাকি আছেন আলহাজ মৌলানা নিয়াজ সরাফ, মৌলানা তাহের গুলাম আলি, কাদের আহমেদ খান, খান সিরাজুল সফির আলি। এরা সকলেই প্রকাশ্যে নিয়মিত দেশবিরোধী প্রচার করে থাকে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, ঘটনাটি কি উপেক্ষা করতে হবে না অচিরেই দমন করা প্রয়োজন? প্রকৃত ভারতীয়রা কিন্তু মনে করছেন, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই এর মূলোচ্ছেদ করা প্রয়োজন। □

# যোগী আদিত্যনাথ বিজেপির এক বিস্ময়কর আবিষ্কার

**দুর্গাপদ ঘোষ**

এবারে (২০২২) উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বারবারই বলতে শোনা গেছে, 'ইউপি মে যোগী হি হ্যাঁয় উপ্ (ইউপি) যোগী।' ২০০০ সাল থেকে বিজেপি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সাধারণ উপযোগী মোদীর ওই কথাগুলি যে কতখানি বাস্তবসম্মত ছিল গত ১০ মাচ নির্বাচনী ফলাফলেই তা প্রমাণিত হয়েছে। রাজনৈতিক পণ্ডিতদের অনেকে প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন যে উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীদের কার্যকালের যে ধারা এযাবৎ চলে এসেছে এবারও তার ব্যত্যয় হবে না। কিন্তু পুরো ৫ বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ করে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীপদে আসীন হয়ে যোগী আদিত্যনাথ ৭০ বছরের রেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়েছেন। কেবল রাজ্যবাসীই নয়, পুরো দেশবাসীকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ইউপি-তে যোগীই হলেন উপযোগী।

রাজনীতিকে যদি নীতির রাজা বলা হয় তাহলে আদিত্যনাথ যোগীকে চোখ বুজে একজন 'রাজর্ষি' অভিহিত করা যেতে পারে। যাঁর মহারাজসিক সন্ন্যাস এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের জীবন একাত্ম হয়ে চলে আসছে ১৯৯৬ সাল থেকে। সে বছর মহন্ত অবৈদ্যনাথ যখন লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হন তখন মাত্র ২৪ বছর বয়সি শিষ্য আদিত্যনাথকে তাঁর নির্বাচনী ম্যানেজারের গুরুদায়িত্ব দেন। সেবার গুরুজীকে সাফল্যের সঙ্গে জেতানোর মধ্যে দিয়ে যোগীর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়। ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ পর্যন্ত একটানা প্রায় ১৯ বছর ধরে লোকসভার সদস্য ছিলেন তিনি। প্রথমবার সাংসদ হন ১৯৯৮ সালে। মুখ্যমন্ত্রিত্বে আসীন হবার সময় তাঁর লোকসভা সদস্যতার মেয়াদ পূর্ণ হতে আরও প্রায় ২ বছর বাকি ছিল। মাত্র ২৬ বছর বয়েসে প্রথমবার লোকসভায় প্রবেশ করেছিলেন।

গতবার বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হবার আগে রাজ্য বিধানসভায়

বিজেপির আসন ছিল মাত্র ৪৭টা। ২০১২ সালে প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ১৫ শতাংশ। বিজেপি নেতৃত্ব আগাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাউকে না রেখে ২০১৭ সালের নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদিও রাজ্য বিজেপির তৎকালীন সভাপতি কেশব প্রসাদ মৌর্য ততদিনে দক্ষ নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তবুও লোকসভা সদস্য হিসেবে সফল যোগীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিকে নজর রেখে চলা বিজেপির শীর্ষ নেতারা, বিশেষ করে মোদী ও অমিত শাহ নির্বাচনী প্রচারে মাঠে নামান যোগীকেও। প্রচার যখন তুঙ্গে এবং যোগী যখন গোটা প্রদেশ জুড়ে দাপিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন তখন ২৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকারের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ গোরক্ষপুরের সাংসদ যোগীকে হঠাৎ করে দিল্লিতে ডেকে পাঠান। বলেন যে, সাংসদদের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে তাঁকে আফ্রিকা মহাদেশের মরিশাসের পোর্ট লুইসে যেতে হবে। কিন্তু রাজ্য জুড়ে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলতে থাকা যোগীকে তখনই বাইরে পাঠাতে রাজি হননি বিজেপির রাজ্য নেতারা। ঠিক হয় ৬ মার্চ শেষ দফার নির্বাচন সম্পন্ন হবার পর সংসদীয় প্রতিনিধিদের দিয়ে মরিশাসে পাঠানো হবে। বলা বাহুল্য, অভিজ্ঞ ও পোড় খাওয়া রাজনীতিক সুষমা স্বরাজ যোগীর মধ্যে নেতৃত্ব দেবার যে যোগ্যতা রয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন।

ভোট গণনার দিন ছিল ১১ মার্চ। যোগীর মরিশাসে যাবার সব ঠিক থাকলেও ১০ মার্চ আচমকা তাঁকে জানানো হয় যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (পিএমও) তাঁর পাসপোর্ট ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে এবং এখন তিনি যেন রাজ্যেই অবস্থান করেন। পরদিন গণনার ফলাফলে দেখা যায় মোট ৪০৩-এর মধ্যে বিজেপি ৩২৫ অর্থাৎ প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আসন জিতে নিয়েছে। ক্ষমতাসীন সমাজবাদী পার্টি পেয়েছে মাত্র ৪৭ আসন। মায়াবতীর বিএসপি জিতেছে ১৯টা আর কংগ্রেসের ঝুলিতে পড়েছে ৭টা। পাঁচ দিন পরে ১৬ মার্চ যোগী সংসদীয় দলের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লিতে যান। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারা যায় যে তখন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলে পাঠান যে তিনি যোগীর সঙ্গে আলাদভাবে কথা বলতে চান। সেইমতো শাহর বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন। কিন্তু চমক তৈরি হবার মতো 'বিশেষ' কিছু প্রকাশ্যে আসেনি। পরদিন ১৭ মার্চ যোগী যথারীতি গোরক্ষপুরে ফিরে আসেন। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যার পরে ফের অমিত শাহর ফোন আসে এবং অবিলম্বে যোগীকে দিল্লি যেতে বলা হয়। ততক্ষণে রাত একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। তখন আর গোরক্ষপুর থেকে দিল্লি যাবার কোনো ট্রেন কিংবা বিমান ছিল না। পরদিন খুব সকালে অমিত শাহ যোগীর জন্য গোরক্ষপুরে একখানা চার্টার্ড বিমান পাঠিয়ে দেন। দিল্লিতে দুজনের

মধ্যে একান্তে ফের কথা হয়। ভারতে আধুনিক রাজনীতির 'চাণক্য' হিসেবে পরিচিত শাহ তাঁকে চটজলদি লক্ষ্ণৌ পৌঁছনোর নির্দেশ দেন। সেখানে দলের তৎকালীন রাজ্য সভাপতি কেশব প্রসাদ মৌর্যর প্রস্তাব মতো যোগীকে সর্বসম্মতিক্রমে বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচন করা হয় এবং এই ভাবে আদিত্যনাথ যোগী ভারতের বৃহত্তম প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীপদে শপথ গ্রহণ করেন।

এর পরের ঘটনাবলীও বস্তুত রোমাঞ্চকর ইতিহাস। যোগীর বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অতি স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, জনসেবার জন্য আন্তরিক নিষ্ঠা, সাংবিধানিক পরিপক্কতার পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রমী এবং একজন সুদক্ষ প্রশাসক, সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার মানসিকতা, নেতৃত্ব দানের কুশলতা, প্রশ্নবাণের মুখে ধীরস্থির অথচ চোখে চোখ রেখে চাঁচাছোলা উত্তর, মাফিয়া গ্যাং-সহ সমস্ত ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীনভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হিম্মত এবং সর্বোপরি উন্নয়নের ঢেউ বইয়ে দেওয়ার মাত্র ৫ বছরের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের খোল-নলচে প্রায় বদলে গেছে (উন্নয়নের বিস্তৃত বিবরণ বারান্তরে তুলে ধরা যেতে পারে)। ফলে ২০২২-এ বিধানসভা নির্বাচনের সময় তাঁকেই যে ফের বিজেপি-র তরফে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা হবে তা ছিল প্রায় অবধারিত। বস্তুত তিন-তিনটে বিধানসভা নির্বাচনের পর এবারই প্রথম এ রাজ্যে বিজেপি আগাম কোনো মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করে নির্বাচনে নেমেছিল। যোগীর নাম ঘোষণা হতে না হতেই বিজেপি কর্মীরা ১৯৯১ সালে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হওয়া কল্যাণ সিংয়ের সঙ্গে যোগীর তুলনা করতে থাকেন। বলা বাহুল্য, একনিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদী বলে কল্যাণ সিং প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর সময় অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশ (তখন উত্তরাখণ্ড গঠিত হয়নি) বিধানসভা মোট আসন ছিল ৪২৫ টা। সেবার বিজেপি জিতেছিল ২২১ আসন। ভোট পেয়েছিল ৩২ শতাংশ। কেন্দ্রে তখন কংগ্রেসের 'চাণক্য' বলে খ্যাত পিভি নরসিংহ রাওয়ের সরকার। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর রামভক্ত করসেবকদের রোষানলে তথাকথিত বাবরি ধাঁচা ধূলিসাৎ হওয়ার প্রেক্ষিতে সেদিন বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং সরকারের পতন ঘটে। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বকাল ছিল মাত্র বছর দুয়েকের। যোগীর আগে সমাজবাদী পার্টির (এসপি) প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব ৩ বার এবং বহুজন সমাজপার্টি (বিএসপি)-র প্রতিষ্ঠাকারী মায়াবতী ৪ বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু দুজনের কেউ-ই লাগাতার এই পদে আসীন হতে পারেননি। যোগীর আগে রাজ্যে আর যাঁরা লাগাতার দুবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তাঁরা হলেন গোবিন্দ বল্লভ পন্ত (১৯৫২), ড. সম্পূর্ণানন্দ (১৯৫৭), চন্দ্রভানু গুপ্তা (১৯৬২), হেমবতীনন্দন বহুগুণা (১৯৭৪) এবং নারায়ণ দত্ত তিওয়ারী (১৯৮৫)। সকলেই ছিলেন কংগ্রেসি নেতা। তবে কারোরই কার্যকাল কোনোবারই পুরো ৫ বছরের ছিল না। বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবার নতুন ইতিহাস গড়লেও তর্কবাগীশদের বক্তব্য, ২০১৭ সালের চাইতে ২০২২-এ বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা ৫২টা কমে গিয়ে ২৭৩ হয়েছে। কিন্তু এইসব সমালোচকরা ভুলেও উচ্চারণ করছেন না যে ২০১৭-তে বিজেপি-জোট মোট ৩২৫ আসনে জিতলেও ভোট পেয়েছিল ৩৯.৬৭ শতাংশ। যোগী জমানায় এবার তা ১.৬ শতাংশ বেড়ে ৪১.৩ শতাংশে উঠেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০১৭ সালে যোগী প্রথমবার যখন মুখ্যমন্ত্রী হন তার আগে এ রাজ্যে বিজেপি কিন্তু ক্রমে পিছিয়ে পড়ছিল। বিশেষ করে ১৯৯২ থেকে ২০০০ এবং ফের ২০০২ থেকে ২০১৭ সালের বিধনসভা নির্বাচন পর্যন্ত। কল্যাণ সিং সরকারের পদত্যাগের পর ২০০০ সালে দলের অন্যতম বরিষ্ঠ নেতা রাজনাথ সিং মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু ২০০২ সালের নির্বাচনে বিজেপি একক ভাবে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। সেবার ৪০৩ আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ৮৮ টাতে। উত্থান ঘটে বিএসপি দলেরও। তবে মায়াবতী কিংবা মুলায়ম সিং কারো দলই নিরঙ্কুশের কাছাকাছি আসতে পারেনি। নির্বাচন পরবর্তী ত্রিশঙ্কু বিধানসভায় বিএসপি এবং বিজেপি-র জোট সরকার গঠিত হয়। চুক্তি ছিল দু'দল থেকেই আড়াই-আড়াই বছর করে মুখ্যমন্ত্রী হবেন। মায়াবতীর দাবিমতো প্রথম দফায় তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী মেনে নেন বিজেপি নেতারা। কিন্তু সময়মতো সেই 'gentleman's agreement' বা ভদ্রলোকের চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে সরে যেতে রাজি না হওয়ায় ২০০৩ সালের ২৫ আগস্ট বিজেপি সেই সরকার থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ফলে মায়াবতীর সরকারের পতন ঘটে। তখন বিএসপি-র অনেক বিধায়ক এবং কয়েকজন নির্দল বিধায়কের সমর্থনে সে বছরের সেপ্টেম্বরে সরকার গড়েন মুলায়ম সিং। সেই থেকে একটানা ১৪ বছর বিজেপি সরকারে ফিরে আসতে পারেনি। ২০১২ সালে সমাজবাদী পার্টি ফের সরকার গড়ার মতো জনসমর্থন লাভ করে। সর্বসম্মতিক্রমে দলের পরিষদীয় নেতা নির্বাচিত হন মুলায়ম সিং যাদব। তখন জাতীয় স্তরে ক্ষমতার রাজনীতির ডামাডোল চলছিল। সেই ঘোলাজলে মাছ ধরার কৌশল নিয়ে মুলায়ম প্রধানমন্ত্রীর কুর্সির দিকে তাক করে নিজে মুখ্যমন্ত্রীপদে না বসে বসিয়ে দেন ছেলে অখিলেশকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী না হতে পেরে কিছুদিন পরে তিনি যখন ছেলের কাছে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ফিরে পেতে চান তখন অখিলেশ বাবাকে সে কুর্সি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। তার আগে ২০০৭ সালের নির্বাচনে বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা নেমে গিয়েছিল ৫২ জনে। ২০১২-তে তা আরও কমে হয় মাত্র ৪৭ জন।

এই প্রেক্ষিতে বলা বাহুল্য, একটা খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ২০১৭ সালে বিজেপির অন্যতম প্রবীণ তারকা প্রচারক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যোগীজী। সেবারের নির্বাচনে বিজেপি পায়ের তলায় খুব শক্ত মাটি তৈরি করে ঘুরে দাঁড়ায় যার পিছনে নরেন্দ্র মোদীর অবাক করা উত্থান এবং মোদী-অমিত শাহর রণকৌশলের সঙ্গে ব্যাপক পরিশ্রম এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কাজ করেছিল যোগী আদিত্যনাথের। এই ত্রয়ীর অসাধারণ বোঝাপড়া এবং প্রশাসনিক পারদর্শিতায় ২০২২-এ যোগী শুধু জয়ের ইতিহাস গড়েছেন তাই নয়, তাঁর বিজয়লাভ হয়েছে বিপুল ভোটের ব্যবধানেও। যোগী মন্ত্রীসভার যতজন এবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন তিনি। তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের খতিয়ান ঘাঁটলে মনে হয় সকলেই একমত হবেন যে, যোগীজী হলেন বিজেপি নেতৃত্বের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। যিনি মুখে যা বলেন কাজেও তা করে দেখান। দেখাচ্ছেনও। □

# রামমোহনের মতবাদকে হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা করাই যায় না

**কল্যাণ গৌতম**

হয়তো নির্ধারিত কালের পূর্বে তাঁর আবির্ভাব। হয়তো কালের আগেই তিনি ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছিলেন। জন্ম হুগলির খানাকুলের রাধানগর গ্রাম। আর মৃত্যু ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহর। কর্ম ও কৃত্যে তো বটেই, জন্ম-মৃত্যুতেও যিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে যুক্ত করলেন, সেই রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২/১৭৭৪-১৮৩৩) ছোটোবেলায় আমাদের কাছে কিছুটা অস্পষ্ট ছিলেন। হয়তো বড়োদের কাছেও। কারণ আপাত-সহজ অথচ প্রতিক্রিয়াশীল একটি জ্ঞাতব্য বাম জমানায় ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছিলাম যে রামমোহন হিন্দু ধর্মের নন, তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে পৃথক এক ধর্মের উপাসক ও প্রচারক, যা হিন্দু ধর্মের থেকে আলাদা; ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়।

হলফ করে বলতে পারি, ছোটোবেলা থেকেই আমার মতো বহু হিন্দু ছাত্র, তাদের বাম মাস্টারমশাইদের এবং পাড়াতুতো অভিভাবকদের শাসনে তা মেনে নিলেও, মনে নেননি। নেবেন কীভাবে? একটা খটকা ছিলই, একটা অঙ্ক না মেলার অস্থিরতাও ছিল। হিন্দুদের অতি প্রাচীন এবং অতি সম্মানিত শাস্ত্রগুলি, বেদ- উপনিষদগুলি ব্রাহ্মদেরও যে অধীত ও আলোচ্য সাহিত্য! তা কী করে হয়? আর কোন কোন ধর্ম আছে যাদের শাস্ত্রীয় আকরগ্রন্থ হুবহু এক? আসলে রামমোহন রায়ের মতো এত বড়ো মাপের নবজাগরণের এক ঋত্বিকের কোনো আত্মজীবনী নেই। বিদ্যাসাগর নিজের আত্মজীবনী শুরু করেও শেষ করেননি, রামমোহন শুরুই করেননি, রচনা ও চিঠিপত্র থেকে জানতে হয় তাঁকে। আত্মজীবনী রচনা করা থাকলে অনেক অজানা প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল নিবারণ হতে পারত। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, আলাদা কোনো ধর্ম হিসেবে নয়।

কেন তাঁকে 'গৌড়ীয়' ব্যাকরণই রচনা করতে হলো? এখানে 'বেঙ্গলি' না বলে 'গৌড়' বলাটা কী এক সাংঘাতিক ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা নয়? এটি কি সনাতনী গৌড়ীয় ঐতিহ্য বিস্তারের অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষা নয়? হিন্দু ব্রাহ্মণের উপবীত আমৃত্যু রামমোহনের সঙ্গে কেন ছিল? কেন খ্রিস্টান সমাধিস্থলে তাঁর দেহ যেন সমাহিত না করা হয়, তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন? কেন তিনি প্রথম জীবনে রাধানগরের পাশের গ্রামের শিক্ষক নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে গভীরভাবে হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের পাঠ নিয়েছিলেন? ছাত্রাবস্থায় হাতের কাছের মাস্টারমশাইদের সমীপ্যে তা আমাদের জানবার উপায় ছিল না (হয়তো তাঁরা জানতেনও না বা জেনেও না জানার ভান করতেন)। রামমোহন নিজেকে কোনওদিন কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের বা বিশিষ্ট ধর্মমতের প্রবর্তক বলে দাবি করেছেন কিনা, ছোটোবেলায় আমরা তা জানতে পারিনি। বাম জমানায় ছোটোদের প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবেত্তা বড়ো-মানুষদের কথাই শুনতে হতো; হিন্দুধর্মের অনুসন্ধানমূলক জ্ঞান আহরণের সুযোগ, প্রশ্নই ওঠে না। বড়ো হয়ে জানবার প্রবৃত্তি অবশিষ্ট থাকলে (বন্ধু-বান্ধবদের অধিকাংশই বামপন্থী হয়ে যাওয়ার পরও) এবং হিন্দুধর্মের মানুষকে বাস্তবের মাটিতে সংকটের মুখোমুখি হয়ে তবেই ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রকৃত সত্যের সন্ধানে রত হতে হয়েছে সে প্রজন্মের মানুষকে।

রামমোহন সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাতে তাঁর নিজের লেখাই উদ্ধৃত করবো। রামমোহন তখন ইংল্যান্ড-প্রবাসী (১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা

*রামমোহনের সমাধিস্থল*

করেন এবং ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ইংল্যান্ডে এসে উপস্থিত হন)। কলকাতার এক ইংরেজ বন্ধু (গর্ডন)-র অনুরোধে একটি চিঠিতে নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে পাঠিয়েছিলেন তিনি, যা এথিনিয়ন লিটারেরি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে। তারই বাংলা অনুবাদ পরে অন্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সেখানে তিনি নিজের সম্পর্কে লিখছেন, 'আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।' জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেই দিচ্ছেন, তিনি হিন্দুধর্মের বিরোধী নন। হিন্দু ধর্মের দেবদেবীকে আক্রমণ করে ষোলো বছর বয়সে রামমোহন যে বই লিখেছিলেন বলে প্রচার আছে, সেই কাহিনিও কিংবদন্তিমূলক বলে জানা গেছে। বিদ্যাবিদেরা (এমন কী বামপন্থীরাও) এর সাপেক্ষে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পরিবেশন করতে পারেননি (অসিতাভ দাশ, ১৯৯৬, বাংলা গদ্যসাহিত্যে নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজর্ষি রামমোহন ও রচনাপঞ্জী, রামমোহন বিশেষ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পৃষ্ঠা-২১১-২১৬)। গীতার প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই তিনি গীতা-মাহাত্ম্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রামমোহনের যা খোঁজার ছিল, তা হলো 'একেশ্বরবাদ' এবং তিনি তা হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে, এমনটাই গৌরবের সঙ্গে এবং আপন প্রতিভার নিরিখেই দেখতে পেলেন। এজন্য কম বাকবিতণ্ডা করতে হয়নি তাঁকে। সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য তিনি তরুণ বয়সে সংসার ত্যাগ করেছিলেন, সত্য সন্ধানেই তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়ালেন, অসীম কষ্ট সহ্য করলেন। কিন্তু সর্বত্র এবং সমস্ত তর্কযুদ্ধে তিনি বিজয়ী সাব্যস্ত হলেন এবং বিলাতেও পূজিত হলেন। একদা সংসার তাঁকে পরিত্যাগ করলেও তিনি শেষপর্যন্ত সংসার পরিত্যাগ করেননি। সমাজের অমঙ্গল তাঁকে আলোড়িত করল, সমাজের কান্নায় তিনিও ক্রন্দনশীল হলেন। এবং সেই অমঙ্গলকে দূর করলেন; হিন্দু ধর্মকে অন্তরের অনুভব দিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন। সংসারে থেকেই ঈশ্বর উপাসনার কথা বললেন এবং হিন্দুধর্মকে সমকালে সংস্কারিত করে বাঁচিয়েও দিয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মসমাজ থেকে পৃথক হয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন মনে করতেন, হিন্দু ধর্মের পুস্তকের মধ্যে একেশ্বরবাদ আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য এবং সহজে বোঝাবার জন্য রামমোহন এসেছিলেন। ঈশ্বর যে জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তাই তিনি করে গেছেন। যে উপনিষদ-পুরাণ থেকে চার হাজার বছর আগে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, সেই ওঁ-কার পুনঃ সংস্থাপন করেছিলেন তিনি। দেশীয় শাস্ত্রের যে বৃহৎ কথাগুলি গহন অরণ্যে পতিত হয়েছিল, তা তিনি উদ্ধার করেছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা চেষ্টা করেও তাঁর সত্যান্বেষণকে বাধা দিতে সমর্থ হননি। বরং দেশের মানুষকে রামমোহন সৎপথ দেখিয়েছিলেন। রামমোহনের এই ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি বিজাতীয় নয়, বিদেশ থেকে আমদানি করতেও হয়নি। এ ভারতীয় ধারাই বটে। এই পদ্ধতির ভিত্তি ছিল উপনিষদের ব্রহ্মমন্ত্র। তাঁর উপাসনালয়ে উপনিষদ পাঠ হতো। আর ছিল সংগীতের মাধ্যমে উপাসনা। সাঙ্গীতিক উপাসনা, সে তো মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ছিলই, নতুন তো নয়! ভারতীয় দেবালয়ে পরিবেশিত কীর্তন সংগীতেরই মতো একটি রূপ। রামমোহনের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, তিনি কেবল ধর্মসাধক ছিলেন না, ছিলেন সংস্কৃতি ও জ্ঞানের গভীরতম অধিকারী, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। এই অধিকার বলেই তিনি অন্ধকার যুগের এক আলোকিত পথিক হতে পেরেছিলেন, অন্যদেরও পথ দেখাতে পেরেছিলেন।

হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে এমন ধর্ম জিজ্ঞাসা উত্থিত হয় না। 'যেখানে জিজ্ঞাসাই জাগে না সেখানে বিচারের অবসর কই? শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য তখন বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না।' ১৮১৫ সালে বেদান্তসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে তিনি যে বই লেখেন, তার নাম 'বেদান্তগ্রন্থ'। যারা তাঁর মতাদর্শকে আলাদা ধর্ম আখ্যা দিয়ে হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন আনতে সক্রিয় হয়েছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি প্রতিবাদী শাখা, পৃথক ধর্ম নয়। তাঁর সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেন লিখছেন, রাজার প্রবর্তিত উপাসনা বিজাতীয় না হইবার নানা কারণ আছে। এক তো রাজা ছিলেন অতিশয় ভারতীয় এবং ভারতের প্রাচীন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাহা ছাড়া তাঁহার সহায় ছিলেন ভারতীয় সাধনায় বৃহস্পতিতুল্য মহানির্বাণ-তন্ত্রমতের শ্রীমৎ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। ...কাজেই রাজার প্রবর্তিত উপাসনারীতিতে সাধনা ও আদর্শের দিক দিয়া ভারতীয় ভাব হারাইয়া ফেলার কোনো ভয় ছিল না।' ক্ষিতিমোহন এ প্রসঙ্গে ব্রজভূমির নিকটস্থ সমসাময়িক ঢেঢরাজ প্রবর্তিত নিরাকার অসীম অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনারীতির। ঢেঢরাজ হিন্দু থাকলে কেন রামমোহন হিন্দু নন? ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভক্ত দাদু ব্রহ্মসম্প্রদায় প্রবর্তিত সাধনমণ্ডলের তুলনাও এনেছেন ক্ষিতিমোহন।

রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করতে করতে, অতি জটিল যুক্তিতর্ক ভেদ করে একেশ্বরবাদে পৌঁছে গেলেন। শাস্ত্র আলোচনা করতে করতেই যে সেই শাস্ত্র-সাগর সেঁচতে হয়, মন্থন করতে হয়, তা তরুণ বয়সে করে দেখালেন রামমোহন। দেখা যাচ্ছে রামমোহন যা করেছেন তা হলো, প্রাচীনতম সনাতনী ভারতীয় আদর্শ ও রীতিগুলিকে যুগোপযোগী করা। বুঝেছিলেন সামাজিক সংহতির জন্যই সামাজিক উপাসনা করতে হবে, এ জন্যই তাঁর সমবেত উপাসনার প্রয়াস এবং ব্রহ্মসংগীত। রবীন্দ্রনাথেরও বহু আগে রামমোহন নিজেই ব্রহ্মসংগীত রচনা করে গেছেন। উপনিষদ ও বেদান্তের প্রতি আধুনিক মানুষের দৃষ্টি তিনিই প্রথম আকর্ষণ করেছেন। বাংলা ভাষায় বেদান্তসূত্র প্রকাশের আগে হিন্দি ভাষায় বেদান্ত ভাষ্য অনুবাদ করেছেন। হিন্দি সাহিত্য রচনারও তিনি অন্যতম আদি লেখক। তাঁর মধ্যে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা নেই, উপরন্তু উপাসনাতে বাংলা ভাষা প্রবর্তন করে তিনি

এই ভাষার একান্ত উপকার সাধন করে গেছেন। ভারতের প্রাচীন ও নবীন বহু ভাষাতে তাঁর প্রজ্ঞা ছিল; পাণ্ডিত্য ছিল ল্যাটিন, গ্রিক, হিব্রু ভাষাতেও। আরবি ও ফারসি লেখাতেও সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি।

ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত জনসেবক ও পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন 'কাঙাল হরিনাথ' (হরিনাথ মজুমদার, ২০ জুলাই ১৮৩৩-১৬ এপ্রিল ১৮৯৬)। হরিনাথ মনে করতেন, রামমোহনের ইচ্ছে ছিল, জ্ঞানাস্ত্রে যুদ্ধজয় করে হিন্দুধর্ম দুর্গ অব্যাহত রাখবেন, কিন্তু অকালে দেহত্যাগ করায় তাঁর ব্রাহ্মধর্ম ওই অবস্থাতেই রয়ে গেল। তিনি ব্রহ্মাণ্ডবেদ-এ রামমোহন সম্পর্কে লিখছেন, রাজা রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র-মহাসিন্ধু মন্থনপূর্বক মহানির্বাণতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসে লিখিত ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন পূর্বক ব্রাহ্মধর্মের মতো একটি সময়োচিত ধর্ম প্রচার করে হিন্দুকুলের গৌরব এবং মর্যাদা রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ রামমোহন রায় হিন্দুধর্মদুর্গ অক্ষত এবং অব্যাহত রাখার সৈনিক, তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন কাঙাল হরিনাথ। জানাচ্ছেন, রামমোহনের নেতৃত্বে ব্রহ্মধর্ম ছিল আদতে হিন্দুধর্মের চর্চা।

বিলেতের ব্রিস্টল নগরে প্রয়াত হলেও শেষ ইচ্ছানুযায়ী স্টেপলটন গ্রোভের নিকটবর্তী একটি স্বতন্ত্র স্থানে নির্জন বাগিচায় রামমোহনের দেহ প্রোথিত করা হয়েছিল। খ্রিস্টানদের সমাধিস্থানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি, তাদের মতেও হয়নি। তাঁর মৃতশরীরে যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হয়েছিল। বিলেতে রামমোহনের সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুর পর সংস্কৃত ভাষায় (হিন্দুস্থানি ভাষায়) প্রার্থনা করেছিলেন, তা উঠে এসেছে বিলেতে তাঁর চিকিৎসক এসলিন সাহেবের দিনপঞ্জীতে। পরে রামমোহনের বন্ধু তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর শব স্থানান্তরিত করে আরনোস ভেল-এ স্থাপন করান এবং সুদৃশ্য সমাধিমন্দির রচনা করিয়ে দেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রামমোহনের জাতও যায়নি। কালাপানি পেরিয়ে যখন দু'-তিন হাজার বছর আগে ভারতীয় হিন্দু বণিকেরা সামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করতেন, তখনও কিন্তু তাদের জাত যায়নি। বিলেতে যাওয়ায় রামমোহনেরও জাত যাবার নয়।

বিপিনচন্দ্র পাল রামমোহনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলছেন, 'অধিকাংশ লোকে ধর্মটাকে অন্তরের অনুভবের উপরে গড়িয়া না তুলিয়া বাহিরের আচার-বিচার দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র যে বেদ, পণ্ডিতেরা এবং জনসাধারণ মুখে ইহা মানিতেন, কিন্তু বেদের অধ্যয়ন দেশে লোপ পাইয়া গিয়াছিল; স্মৃতি এবং পুরাণই ধর্মের প্রমাণ্য-শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই সকল স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা আছে। এই সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া পুরাণের স্মৃতির উদ্ঘাটন ও মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা কেহ করিতেন না, নিজেদের সুবিধামতো শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিতেন মাত্র। ...যে বেদশাস্ত্রের উপরে হিন্দু আপনার ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করে সেই বেদই যে জগতের সনাতন সত্যকে মানবের অনুভবসাপেক্ষ করিয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্যই, মনে হয়, রাজা রামমোহন উপনিষদ ও বেদান্ত-সূত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য— এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও বাংলা অনুবাদ প্রচার করেন। আর এই ক'খানি উপনিষদই মোটের উপরে বিশ্বের পরমতত্ত্ব ব্রহ্মবস্তুকে সাধারণ মানবের সাধারণ অনুভবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

রামমোহন পরবর্তী সময়ে বঙ্গজীবনে হিন্দুদের মধ্যে চতুর্মুখী ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মরা ছাড়াও ছিল রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ধর্মসভাপন্থীরা, ডিরোজিও-র নেতৃত্বে অত্যুগ্র অনুগামীরা এবং কিছুটা ব্যক্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগরেরা। উগ্র হিন্দু বিরোধী ডিরোজিয়ানরা গর্জন করে বলেছিলেন, 'হিন্দুধর্ম নিপাত যাক, গোঁড়ামিপনা নিপাত যাক।' এই মতবাদ অবশ্য ব্রাহ্ম এবং ধর্মসভাপন্থীদের মনঃপূত হয়নি। বরং হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তার পরিণতিতে ডিরোজিয়ানরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। বিদ্রোহও ব্যর্থ হলো। যারা ইয়ং বেঙ্গলকে মহীয়ান করতে এখনও সচেষ্ট, তারাই আদতে রামমোহন ও তাঁর মতাদর্শকে পৃথক ধর্মের অনুসারী বলে দাগিয়ে দিতে চান। একসঙ্গে একত্রে কাজ করে কিছু ভাড়াটে ঐতিহাসিক, সেকুলারপন্থী এবং রাজনৈতিক দলের কর্মীরা।

রামমোহন সম্পর্কে মুসলমান বিদ্বজ্জনের মতামত কেমন ছিল, তা আলোচনা করতে আমরা এবার কাজী আবদুল ওদুদ-এর মূল্যবান বক্তব্য নিরীক্ষণ করতে পারি। দেশের মানুষের প্রতি রামমোহনের নির্দেশ সম্পর্কে ওদুদ বলছেন, পৌরাণিক দেবদেবীর আরাধনার পরিবর্তে উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ও যুক্তিযুক্ত কল্যাণ-কর্মের অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন রামমোহন। বলছেন, প্রাচীন শাস্ত্র অশ্রদ্ধেয় নয় কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতে হবে বিচারবুদ্ধি ও লোকশ্রেয়ের আলোকে— অনিষ্টকর আচার প্রাচীন হলেও বর্জনীয়।

রামমোহন চেয়েছিলেন শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে বাঙ্গালি হিন্দু ধর্মকে তার অনুভবে প্রতিষ্ঠিত করতে। রামমোহনের এই যুক্তিবাদ ইউরোপীয় যুক্তিবাদের অনুকরণে আসেনি। দেখা যাচ্ছে, রামমোহন ইংরেজির বর্ণমালার সাহচর্যে আসার পূর্বেই তিনি নিজের ব্রত ও লক্ষ্য নির্ণয় করে ফেলেছিলেন। বিশ্লেষকদের মতে রামমোহনের এই যুক্তি এসেছিল প্রাচীন মীমাংসার পথ ধরে। রামমোহন চেয়েছিলেন দেশবাসীর চিন্তা ও চিত্তকে অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে। কেন চেয়েছিলেন? কারণ হিন্দুর ধর্ম যদি স্বাধীন হয়, তবেই হিন্দু স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হবে। রামমোহন ছিলেন অন্তরে ভারতের স্বাধীনতার পূজারি। ধর্ম যেখানে সংস্কারবদ্ধ হয়েছে এবং তার ফলে নিজের গতি হারিয়েছে, সেই প্রাণময়তাহীন ধর্মকে সংস্কার মুক্ত করে সজীব করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই পথেই তিনি ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। জাতীয় জীবনে এ এক নতুন পথের সূত্রপাত আর সেজন্যই তিনি যুগ প্রবর্তক। □

# মূল্য বৃদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছে কোভিড ও যুদ্ধ

**তারক সাহা**

মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার পুরো দুনিয়া। ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। কোভিড পর্বের শেষে শ্রীলঙ্কার দেউলিয়া দশা, নেপালের অবস্থাও সেরকম। নেপালের অবস্থা এতটাই সঙ্গীন যে, দেশে মাত্র ছয় মাসের আমদানির জন্য বিদেশিমুদ্রা মজুত। তাই সেদেশের সরকার সজাগ। অযথা খরচের ওপর লাগাম পরানো হয়েছে। নাগরিকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে বিদেশি টিভি, ফ্রিজের মতো বিলাসবহুল দ্রব্য ক্রয় না করতে। এমনিতেই এই দুই দেশ অনেকটাই নির্ভরশীল পর্যটন শিল্পের ওপর। কোভিড সেইপথে বাদ সেধেছে। সামগ্রিকভাবে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির আর্থিক পরিস্থিতি বেশ সঙ্কটাপন্ন।

ভারতের পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কা, নেপালের মতো ভয়ানক না হলেও আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে সরকার স্বস্তিতে নেই। পাইকারি মূল্যসূচক ইতিমধ্যেই ছাড়িয়েছে ১৪.৫ শতাংশ। দীর্ঘমেয়াদি মুদ্রাস্ফীতির আবর্তে রয়েছে দেশ। খুচরো মূল্যসূচক রেকর্ড সাড়ে সাত শতাংশ ছাড়িয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধি কুঠারাঘাত করেছে নাগরিক ক্রয়ক্ষমতার ওপর। চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় বৃদ্ধি তলানিতে ঠেকেছে। এপ্রিল মাসে উৎপাদনসূচক চার শতাংশ কমেছে।

মূল্যবৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সুদের হার চড়াতে হবে অর্থনীতির নিয়ম মেনে। এর ফলে ধাক্কা আসবে দেশের শেয়ার বাজারে। ব্যাংকের সুদ বাড়লে সুদ নির্ভর মানুষ অতিরিক্ত ঝুঁকি কেন নেবে শেয়ারে লগ্নি করে। পেনশন নেই এমন মানুষজন যারা এতদিন ব্যাংক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিউচুয়ালযোগ্য, শেয়ারে লগ্নি করছিল বাড়তি আয়ের আশায়, এই মূল্যবৃদ্ধি সেইপথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চড়া বাজারের যুগে একমাত্র তরুণ-তরুণীরা যারা সদ্য চাকরিতে নিযুক্ত তারাই একমাত্র ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাইকারি মূল্যসূচক ঘোরাফেরা করছিল ১২ শতাংশের ঘরে এবং খুচরো মূল্যসূচক ৬ শতাংশের আশেপাশে। অভিজ্ঞমহল ভাবছিল সম্ভবত এই মূল্যসূচককে এর মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হতেই পরিস্থিতি আমূল বদলে গিয়েছে।

পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি তাদের নিজ নিজ দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে এতটা ভাবেনি। মার্কিন মুলুকে মুদ্রাস্ফীতির হার ছাড়িয়েছে ৮.৫ শতাংশের গণ্ডি। ইউরোপের মুদ্রাস্ফীতি সাড়ে সাত শতাংশ। অথচ সাধারণভাবে এই দেশগুলির মূল্যসূচক দুই শতাংশেই আবদ্ধ থাকত। কিন্তু কোভিড মহামারী দুনিয়ার জোগান শৃঙ্খলকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। দেশের রিজার্ভব্যাংকও সেটা আগাম আঁচ করতে পারেনি।

কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলেছে। ২০২১-এর শেষভাগে অপরিশোধিত তেলের দাম ছাড়িয়েছে ৯০ ডলার প্রতি ব্যারেল, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে প্রায় সব ধাতুর দাম। ফেব্রুয়ারিতে অর্থমন্ত্রী সীতারামন যখন বাজেট পেশ করেছেন ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়নি, আর তেলের দাম সেইসময়ে ৭৫ ডলার প্রতি ব্যারেল ধরে নিয়েই বাজেট পেশ হয়। এখন সেই তেল প্রতি ব্যারেল ছাড়িয়েছে ১০০ ডলারেরও ওপর। সুতরাং এই মূল্য পার্থক্যই দেশের মূল্যবৃদ্ধিকে ইন্ধন জুগিয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বে মার খেয়েছে উৎপাদন।

ইউক্রেন যুদ্ধ কৃষ্ণসাগরের বাণিজ্যকে ব্যাহত করেছে। ব্যাহত হচ্ছে বিপুল পরিমাণে কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো পশ্চিমি দেশগুলি রাশিয়ার রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ফলে বাজার ধারণ করেছে অগ্নিমূর্তি। আশাবাদীরা ভেবেছিল যে, ইউক্রেনের যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে না, কিন্তু দু'মাস অতিক্রান্ত করেও যুদ্ধ থামার কোনও আশু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যুদ্ধ ইতিমধ্যে প্রভূত ক্ষতি করেছে এবং সত্বর যুদ্ধ না থামলে মার খাবে গম, সূর্যমুখী তেলের মতো ভোজ্যতেলের চরম সংকট। সমস্যা যে কোথায় গড়াবে তা এখনই কেউ অনুমান করতে পারছে না।

বর্তমানে বিশ্বের যা আর্থিক পরিস্থিতি তা কোনওভাবেই মাইক্রো ইকনমিকসের সাধারণ তত্ত্ব মেনে চলছে না। মুদ্রাস্ফীতির এই ঊর্ধ্বগতি কোনও ভাবেই বন্ধ হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর পশ্চাতে হয়তো রয়েছে কারিগরি প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা। এর সঙ্গে রয়েছে পরিবেশবিদদের চাপ যাতে কয়লা বা তেলের দৈনন্দিন ব্যবহার কম হয় অথবা বন্ধ হয়ে যায়। এদের চাপে নতুন করে কোনও বিনিয়োগ আসছে না কয়লা, খনি খননের ব্যবসায়। এই পরিবেশবাদীদের জন্যই ব্যাহত হচ্ছে উচ্চফলনশীল জেনেটিক্যাল মডিফায়েড কৃষিপণ্যের উৎপাদন। এদের প্রভাবেই স্থানীয় উৎপাদনের খামতি মেটাতে বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছে। সংক্ষেপে বলা যায়, সবুজ দুনিয়ায় আরও বেশি করে জোগানে বিপত্তি ঘটাবে।

মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে। এর পেছনে যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে হলো রাজনৈতিক নেতাদের খামখেয়ালিপনা। যেমন রাশিয়া অযাচিতভাবে ইউক্রেন আক্রমণ করে সাধারণ মানুষকে দেশে-বিদেশে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ধনী দেশগুলির আগ্রাসী মনোভাব, দেশে দেশে সুসম্পর্ক ইত্যাদি অনেক কিছুরওপর নির্ভর করে চাহিদা জোগানের সমন্বয়। তাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে রাজনৈতিক কারণেই সরকারের বিরোধিতা করলেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে সাধারণ মানুষের কোনও নিষ্কৃতি নেই। □

## পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে মোল্লাপ্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে বিশেষত তথাকথিত সেলিব্রেটিদের মধ্যে মোল্লাদের অনুকরণে সাজপোশাক করা বা দাড়ি রাখা একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। স্বভাবত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি তরুণ সমাজও এতে প্রভাবিত হচ্ছে, অনুপ্রাণিত হচ্ছে। আজকাল অনেককেই দেখা যাচ্ছে পোলাও বা ফ্রায়েড রাইসের বদলে বিরিয়ানির ভক্ত হয়ে উঠছে। ফলে পাড়ায় পাড়ায় বিরিয়ানির দোকান গজিয়ে উঠছে। কলকাতা শহরের বাঁশদ্রোণী, ইএম বাইপাস প্রভৃতি হিন্দু এলাকায় আমিনিয়া, সিরাজ, সাবির, আমজাদিয়া প্রভৃতি রেস্টুরেন্টগুলি গজিয়ে উঠছে আর রমরমিয়ে চলছে। খরিদ্দাররা প্রায় অধিকাংশই হিন্দু, তারা গবগবিয়ে বিরিয়ানি খাচ্ছে, গোরুর মাংসের কিনা জানাটা প্রয়োজন মনে করছে না। খরিদ্দাররা সেই সঙ্গে কাবাব রোস্ট প্রভৃতির অর্ডার দিচ্ছে আর মহানন্দে সেগুলির সদ্ব্যবহার করছে।

এই সমস্ত খরিদ্দারদের অধিকাংশই, পূর্বপাকিস্তান বা বাংলাদেশে সেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের নৃশংসভাবে নিহত হতে দেখে আর নিজেদের অপহৃতা স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের দুবৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করতে না পেরে নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে রাতের অন্ধকারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় একবস্ত্রে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে। এবার তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম বা বংশধর। এরা অতীতকে ভুলে গিয়ে বিভিন্ন মিটিং মিছিলে স্লোগান দেয় 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই ভেদ নাই ভেদ নাই' আর গান গায় 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান'। তাদের পূর্বপুরুষদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে এরা সব করে।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

## মন্ত্রীর রসিকতা

নানারকম মজার কথা শোনা যাচ্ছে—সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিধানসভায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতার ফাঁকে একটি গল্প বলেছিলেন :

এক বাবা তাঁর তিন ছেলেকে ১০০ টাকা করে দিয়ে বললেন, 'এমন কিছু কিনে আনো যাতে পুরো ঘরটা ভর্তি হয়ে যায়। প্রথম ছেলে ১০০ টাকার খোড় কিনে আনল কিন্তু তাতে পুরো ঘর ভর্তি করতে পারলো না।

দ্বিতীয় ছেলে ১০০ টাকার তুলো কিনে আনল। কিন্তু তাতেও ঘর পুরো ভর্তি হলো না।

তৃতীয় ছেলে ৫ টাকা দিয়ে একটি মোমবাতি কিনে আনল এবং ঘরের মাঝখানে রেখে জ্বালাল। এতে পুরো ঘর আলোতে ভরে উঠল।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলতে লাগলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে তৃতীয় ছেলের মতো। যেদিন থেকে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন এই রাজ্য উন্নতির আলোয় ভরে উঠেছে।' পেছন থেকে আওয়াজ উঠল : সেটা তো ঠিক আছে কিন্তু বাকি ৯৫ টাকা কোথায় গেল?

—**দীপক খাঁ,**
পাটপুর, বাঁকুড়া।

## ভারতীয় মুসলমানরা ইন্দোনেশিয়ার দিকে দেখুন!

ইন্দোনেশিয়া বৃহত্তম মুসলমান দেশ। ওখানে বছরের নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মা-বাবাকে আরাধনা করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে জীবনের পথে অগ্রসর হয়। ওদেশে তাই কোনো বৃদ্ধাশ্রমের দরকার পড়ে না। চিন্তা করুন একটা মুসলমান দেশ যা পারে তা ভারতবর্ষ কেন পারে না? ভারত তো ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, তবে সমস্যা কোথায়? সমস্যা আমাদের আন্তরিকতায়। এখানে মানুষ সবকিছুতেই রাজনীতি দেখতে পায়। এখানে অনেকেই মনে করেন ওসব করে কি পেট ভরবে? ওসব করে কি চাকরি হবে? যারা গলার শিরা ফুলিয়ে এই যুক্তি খাড়া করেন তারাই কিন্তু ঘটা করে নভেম্বর বিপ্লবকে স্মরণ করে লাল পতাকা দিয়ে শহর-গ্রাম সাজান।

বলতে পারেন এই কাজে কজনের পেট ভরে? ক'জনরেই-বা চাকরি হয়? আসলে তারা বিশ্বাস করে আন্তর্জাতিকতাবাদে। তাইতো তারা বার্লিনে বৃষ্টি পড়লে কলকাতায় ছাতা খোলেন। আসলে ওদের সামনে বাকিরা তাদের মতামত তুলে ধরতে পারেন না। তার প্রধান কারণ ওদের সঙ্গে মুসলমান সমাজের যোগ। ওরাই তখন হিন্দুত্ববাদী কার্যকলাপ বলে সাম্প্রদায়িক রং খুঁজে বের করে। তার সঙ্গে বাকি নীতিহীন ও 'যখন যেমন তখন তেমন' দলগুলো যোগ দিয়ে অন্যদের মুখ বন্ধ করে দেয়।

ইন্দোনেশিয়া মুসলমান দেশ। ভাবতে পারেন ওদের জাতীয় পার্কের নাম 'লব-কুশ' পার্ক। ওদের জাতীয় বিমান সংস্থার নাম 'গড়ুর এয়ারওয়েজ'। এসব নাম তো হিন্দু ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। কই মুসলমান হয়েও তো তারা প্রশ্ন তোলেননি? আসলে ওদেশে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট নেই। এরাই ভারতবর্ষের কাল। ইন্দোনেশিয়ার মানুষ গর্বের সঙ্গে বলে, 'We have changed our Religion not our forefathers culture'। আমাদের দেশের মুসলমান সমাজের কবে এই উপলব্ধি হবে? তাহলে আমাদের আর সমস্যা থাকবে না। আমরা কী আমাদের ভাবনার পরিধি একটু বাড়াতে পারি না?

—**শ্যামল হাতি,**
চাঁদমারী রোড, হাওড়া।

ফঃ ৩

## ‘বাঙ্গালির অন্তর্জলিযাত্রা’ একটি সময়োচিত বিশ্লেষণ

গত ২ মে সংখ্যায় জিষ্ণু বসুর বাঙ্গালি জাতির প্রতি আদ্যন্ত মমতা ও তজ্জনিত সঠিক উদ্বেগ মিশ্রিত লেখাটি পড়লাম। তিনি গণতন্ত্রের প্রহরীদের ব্যর্থতা চিহ্নিত করার পাশাপাশি একার কাঁধেই অনেকগুলি দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন— (১) সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে বিক্রি হয়ে যাওয়া সংবাদমাধ্যমগুলির বিকৃত সংবাদ পরিবেশনে অভ্যস্ত বাঙ্গালিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরিগনার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ধরে ২০২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসার যে ভয়াবহ অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে বোঝা যায় কেন ভাইপো এই কেন্দ্র থেকে সংসদে যান। তিনি এই লোকসভার অন্তর্গত সাতগাছিয়ার উল্লেখ করেছেন। জ্যোতিবাবু সেই একই কারণে সংখ্যালঘুর কাঁধে ভর দিয়ে সল্টলেক থেকে এসে এখান থেকেই নিরাপদে বিধানসভায় যেতেন। তিনি পরাধীন বাঙ্গলার প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক হরিশ মুখার্জিকে প্রসঙ্গত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রবীন্দ্রসদন থেকে কলকাতার দক্ষিণমুখী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি যাঁর নামাঙ্কিত তিনি আজ সম্পূর্ণ অপরিচিত। অকালমৃত চিরস্মরণীয় বাঙ্গালি কালীপ্রসন্ন সিংহ আমৃত্যু হরিশ মুখার্জির সঙ্গী ছিলেন।

(২) নিখুঁত পরিসংখ্যান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রথম নির্বাচন থেকে আজ অবধি বিজেপি-ই যে বিরোধী দল হিসেবে সর্বাপেক্ষা বেশি আসন পেয়েও দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এক অযাচিত হীনমন্যতায় ভুগছে তা তুলে ধরেছেন। বিষয়টি দলের বিচার বিশ্লেষণ নেওয়া বৃহত্তর প্রয়োজন। চারপাশে মানুষের সঙ্গে আলোচনা করলে শোনা যায় বিজেপির এখানে ভবিষ্যৎ নেই। যেন ধরেই নেওয়া হয়েছিল বিজেপি ক্ষমতায় এসে গেছে। নেতারা এই পরিসংখ্যানগুলি হতাশ কার্যকর্তাদের কাছে তুলে ধরতে কি পারেন না?

(৩) লেখাটির অন্তর্লীন সুর সেই অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ সম্বলিত নির্লিপ্ত বাঙ্গলাকে নিয়ে। যা দ্বর্থহীনভাবে জানায় শাসকের পদলেহন দ্বারা অর্থাগমে অভ্যস্ত ও সে কারণে কেবলমাত্র নিজ পরিসরে আবদ্ধ থাকা উদাসীন বাঙ্গালির (তথাকথিত মোমবাতিজীবী-সহ) শেষের সেদিন কী ভয়ংকর! আমি লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে আজ থেকে ২টি প্রজন্ম পরেই সম্ভবত এখানকার হিন্দু বাঙ্গালি তার পদবি বাঁচাতে পারবে না। কেবলমাত্র আজকের তথাকথিত সংখ্যালঘুদের দ্বারা তারা অধিকৃত হয়ে যাবে। দু’একদিন আগে ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’ প্রথম পাতায় মহানন্দে প্রকাশ করেছিল দেশে সব ধর্মের মানুষেরই প্রজনন হার কমছে। আগে কেউ ২০টি উৎপাদন করত অন্যজন ৪টি করল। এখন সে ১০টি করছে আর ইনি ২টি করছেন। সুতরাং সংখ্যাগত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর এ কথাও সম্ভবত ওইসব ধর্মগ্রন্থ বলে চালানো মূলত আগ্রাসনরীতি নির্ধারণের বইগুলিতেও ('rule by number') দার-উল-উলম এবং দারউল হারবের বিশদ ব্যাখ্যা নিশ্চয় আছে।

লেখাটি পড়তে পড়তে অবশ্যম্ভাবী অসহায়তায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনুভব করেছি। আশপাশেই শুনছি প্রমোটাররা বাড়ির মালিককে ন্যূনতম ৩টি করে ফ্ল্যাট আগ্রাসনকারীদের অ্যালট করার চুক্তি করলে বাড়তি টাকার টোপ দিচ্ছে। জিষ্ণুবাবু থানায় নির্যাতিত হওয়ার পর এফআইআর করতে যাওয়া বীরাঙ্গনাদের মধ্যে আশার আলো দেখেছেন। আমাদের বয়স হয়েছে। কমলকুমারের ‘অন্তর্জলি যাত্রা’র অশীতিপর সীতারাম জ্যোতিষীর কথা মিলিয়ে দোসর নিয়েছিল। অর্থাৎ স্ত্রী সহমরণে গিয়েছিলেন। নোবেল লরিয়েট ভারতীয় বংশজাত বিদ্যাধর নইপাল বলেছিলেন— ‘to be converted you have to destroy your past, destroy your history.’ মহারাষ্ট্রের শহরগুলিতে ইদের দিন ১১৪১ টি সমজিদের মধ্যে মাত্র ১৩৫টিতে মাইক বেজেছে। এটি আশার আলো বলে মনে করছি। না হলে, ভিন্নজাতির দোসর নিয়ে অন্তর্জলি যাত্রার হাতছানি রয়েছে। জিষ্ণুবাবু অসাড় বাঙ্গালির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

**—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
হাওড়া, শিবপুর।

## ত্রুটি

গত ৭.৩.২২ তারিখের স্বস্তিকার ১৯নং পাতায় রঙ্গম কলমে সংস্কৃতি জগতের উজ্জ্বল দুই নক্ষত্র নামে রূপশ্রী দত্তের যে লেখাটা ছাপা হয়েছে, তাতে যে দুই নক্ষত্রর ছবি ও তলায় দুটি নাম দেওয়া আছে, তার মধ্যে একটি কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং অন্যটি অরুন্ধতীদেবীর, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র দে-র নামে যে ছবিটি ছাপা হয়েছে সে ছবিটি কৃষ্ণচন্দ্র দে-র নয়। সে ছবিটি আর এক দিকপাল গায়ক শ্রীপঙ্কজ কুমার মল্লিকের।

**—জয়ন্ত কুমার মিত্র,**
মিত্র ভবন, ১৪, বিএল, হাটীরোড,
ঢলদিঘী।

অনিচ্ছাকৃত ভুল ছবি ছাপার জন্য দুঃখিত।
**—স্ব: স:।**

## বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে **‘বাঙ্গলায় সঙ্ঘের কাজের ইতিহাস’** নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০্ টাকা। প্রকাশপূর্ব রাশি ১৫০্ টাকা।

বিস্তারিত পরে জানানো হচ্ছে। প্রকাশ পূর্ব রাশি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২।

# নারীকে নরকের দ্বারে পরিণত করেছে শরিয়ত

সুতপা বসাক ভড়

আমাদের মাতৃভূমিতে প্রত্যেক ভারতীয়ের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য হলো আমাদের বৈশিষ্ট্য। সেই কারণে আমাদের বিভিন্ন জাত, ধর্ম থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেকের দেশ ভারত। আমাদের পরিচয় আমরা ভারতবাসী। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে অসম, আমরা একই পরিচয়ের ঐক্যসূত্রে বাঁধা। একই সংবিধানের আওতায় আমরা সুরক্ষিত। এই পর্যন্ত সবকিছুই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের দেশে কি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) আছে? এক দেশ, এক জাতীয় পতাকা, এক জাতীয় সংগীত; অথচ বিশেষ আইনে প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কেবলমাত্র ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের মহিলারা। বিবাহ, সম্পত্তির মালিকানা, সন্তান প্রতিপালন, দত্তক নেওয়া ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে শরিয়তের দোহাই দিয়ে। ছোটো ছোটো মেয়ে ও মহিলা চরম অবহেলিত, অত্যাচারিত, অবদমিত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, একটি বারো বছরের বালিকাকে শরিয়তের দোহাই দিয়ে যুবক থেকে বৃদ্ধ তার শারীরিক, মানসিক শোষণ করে চলেছে।

Missar marriage বা Traveller's marriage নামক কুপ্রথা এখনও প্রচলিত। আমাদের দেশের মধ্যেই হায়দরাবাদে আরব দেশগুলি থেকে সত্তর আশি বছরের শেখেরা আসে। তারা এখানে এসেই তাদের পছন্দমতো ১২/১৩ বছরের নাবালিকাকে 'নিকাহ্' করে। এরপর শুরু হয় মেয়েটির শারীরিক, মানসিক শোষণ, অত্যাচার। যতদিন ওই বিদেশি শেখরা আমাদের দেশে থাকে, ততদিন ধরে ওই মেয়েগুলির ওপর চলে অমানবিক অত্যাচার। এরপর তারা সেই মেয়েদের এখানেই ফেলে ফিরে যায় নিজেদের দেশে। অনেক ক্ষেত্রে ওই মেয়েগুলিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে। বার বার বিক্রি করতে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, কেন, কোন আইনের অজুহাত দিয়ে আমাদের দেশের নাবালিকাদের সঙ্গে এই জঘন্য দুষ্কর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়? এই মেয়েগুলির জীবন কি শুধুমাত্র এই জন্য? তারা কেন সুস্থ জীবন পাবে না? কেন তারা পড়াশুনা শিখে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর কোনো অধিকার পাবে না? আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য শিক্ষার অধিকার আছে। ওই নাবালিকাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে কেন? এই অন্যায়ের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি হওয়া অত্যাবশ্যক। একটি মেয়ের সঙ্গেও যাতে অন্যায় না হয়। যে শরিয়তের দোহাই দিয়ে মানুষের সঙ্গে অমানবীয় ব্যবহার করা হয়, সেই শরিয়তের অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন আছে কি? এরপর আসছে বহুবিবাহ প্রসঙ্গ। শরিয়ত একজন মুসলমান পুরুষের চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়। সেজন্য অনেক মুসলমান পুরুষ বর্তমান যুগেও একজন স্ত্রীর বর্তমানে শরিয়তের দোহাই দিয়ে বহুবিবাহ করে থাকে। একই ছাদের নীচে একাধিক স্ত্রী নিয়ে ঘর করে এবং সন্তান উৎপাদন করে।

দুর্ভাগ্যবশত কোনো মহিলা সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম হলে, দত্তক সন্তান গ্রহণের অধিকার শরিয়ত তাঁকে দেয় না। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর স্বামী পুনর্বিবাহ করে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কোনো মহিলার স্বামীর মৃত্যু হলে তাদের সন্তানকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন নিজেদের কাছে রেখে ওই মহিলাকে বাড়ি ও সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করেছে। এই ধরনের ঘটনার প্রশ্রয় দেওয়া হয় শরিয়তের নামে।

সময় এসেছে ভাবার, সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার। শুধুমাত্র শরিয়তের দোহাই দিয়ে নাবালিকাদের ওপর, মাতৃজাতির ওপর অত্যাচার করার অধিকার কারও নেই। কেবলমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মাবার জন্য অত্যাচারিত হতে হবে? এ কোন 'আইন' যার বলে পুরুষরা ভোগ-লালসাকে চরিতার্থ করে চলেছে? মুসলমান মহিলাদের প্রতি প্রতিনিয়ত হয়ে যাওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে একমাত্র অস্ত্র হলো অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োগ।

শরিয়ত সমাজে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে তীব্র বিভেদ সৃষ্টি করছে। সমাজে অন্যায়, দুষ্কর্ম বৃদ্ধিতে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যে আইন ব্যক্তি, সপরিবার, সমাজ, দেশের রক্ষার্থে প্রযুক্ত হয়, সেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) সমগ্র দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কল্যাণার্থে প্রযুক্ত হোক, এটাই কাম্য। □

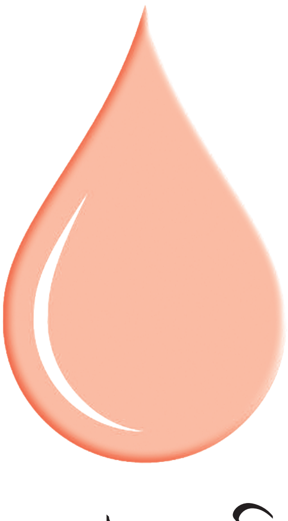

# রক্তদানের কিছু নিয়মকানুন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

সমীক্ষা বলে, সারা বিশ্বে প্রতি দুই সেকেন্ডে একজন করে মানুষের রক্তের প্রয়োজন হয়। একই সঙ্গে সমীক্ষা এও বলে যে, ভারতের ক্ষেত্রে রক্ত দানের সঙ্গে সচেতনতা শব্দটির থেকেও যে শব্দটি জুড়ে রয়েছে তা হলো ভয়। এখনও রক্ত দেওয়ার আগে মানুষ ভাবনায় পড়ে যান, আদৌ কাজটা ঠিক হচ্ছে তো?

২০০৫ সালে ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলি ১৪ জুন তারিখটি রক্তদাতা দিবস হিসেবে নির্ধারণ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একটি দেশের সমগ্রিক জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ যদি নিয়মিত রক্ত দান করেন, ত হলে সে দেশের ন্যূনতম রক্তের চাহিদা মেটে।

**রক্তের কী কী অংশ দান করা যায়?**

রক্ত মানুষের দেহের তরল যোজক কলা, যা মূলত পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। রক্তে থাকে রক্তকণিকা, প্লেটলেট ও প্লাজমা। এক ইউনিট রক্ত থেকে এই তিনটি জিনিসই ব্যবহার করা যায়, অর্থাৎ বলা চলে এক ইউনিট রক্ত কম করে তিনজন মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে। একজন ডোনার ইচ্ছে করলে সমগ্র রক্ত বা হোল ব্লাডও দিতে পারেন অথবা রক্তের বিশেষ উপাদান যথা প্লেটলেটও দান করতে পারেন। মানবদেহের মোট ওজনের শতকরা সাত ভাগ রক্ত থাকে। সাধারণত, একজনের দেহ থেকে একবারে এক ইউনিট রক্ত নেওয়া হয়। এই রক্ত দাতার দেহে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় তৈরি হয়ে যায়। ফলে দাতার কেনো ক্ষতি হয় না।

**রক্তের গ্রুপ কী?**

সাধারণত মানব দেহে আট ধরনের রক্ত দেখা যায়। সেগুলি হলো, এ +, ও +, বি +, এবি +, এ –, ও –, বি –, এবি –। উল্লেখ্য, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয় যায় বি + রক্ত এবং সবচেয়ে কম এবি – রক্তের গ্রুপ। রক্তে তিনটি অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অনুসারে রক্তের গ্রুপ নির্ধারিত হয়। এই তিনটি অ্যান্টিজেন হলো, এ অ্যান্টিজেন, বি অ্যান্টিজেন ও আর এইচ ফ্যাক্টর অ্যান্টিজেন। অ্যান্টিজেন অনুসারে একজন অন্যজনকে রক্ত দিতে পারে। রক্তের গ্রুপ যদি ভুল হয়, তবে গুরুতর শারীরিক সমস্যা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

**নিয়মিত রক্ত কাদের প্রয়োজন হয়।**

জন্মসূত্রে কিছু অসুখ, ক্যানসার গ্রুপ টেস্ট বা জটিল অপারেশন হয়েছে, এমন ব্যক্তির নিয়মিত রক্তের প্রয়োজন হতে পারে। মাসে এক বার বা দু'বার রক্ত না দিলে এঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

**থ্যালাসেমিয়া-সহ বিভিন্ন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া :** ভারতে থ্যালাসেমিয়া খুব পরিচিত একটি জিনঘটিত রোগ। এই অসুখে সারা জীবন ধরে মাসে কমপক্ষে দু'বার করে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের প্রয়োজন হয়। এক মাত্র বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন হলে তবেই এ-রোগ নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতি বছর অন্তত এক লক্ষ থ্যালাসেমিক শিশুর জন্ম হয় সারা বিশ্বে। তাদের মধ্যে ১০ হাজার জনের জন্ম হয় ভারতে। থ্যালাসেমিয়ার মতো আর একটি অসুখ অটোইমিউন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া। যাতে মিয়মিত রক্তের প্রয়োজন হয়।

**কিডনি সংক্রান্ত অসুখ ও রেনাল ফেলিয়োর :** কিডনির অসুখে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের প্রয়োজন হয়। নিয়মিত ডায়ালিসিস চলে এমন মানুষদের নিয়মিত রক্তের প্রয়োজন। একই রকমভাবে সাধারণ অ্যানিমিয়ায় যাঁরা ভুগছেন, তাঁদেরও অনেক সময় রক্ত দিতে হয়।

**ক্যানসার ও বিভিন্ন অঙ্কোলজিক্যাল সমস্যা :** নিয়মিত কেমোথেরাপিতে অনেক সময়ই রক্তাল্পত দেখা যায়, ফলে রক্তের প্রয়োজন হয়।

**ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি :** ম্যালেরিয়াতে লোহিত কণিকার ক্রমাগত ক্ষয়ের ফলে রক্তশূন্যতা দেখা যায়। ফলে রক্তের প্রয়োজন হয়। ডেঙ্গিতে ভীষণ ভাবে প্লেটলেট কমতে থাকে। ফলে বেশিরভাগ সময়ই রোগীকে প্লেটলেট দিতে হয়।

**হিমোফিলিয়া :** থ্যালাসেমিয়ার মতো এতেও নিয়মিত রক্ত দিতে হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতি ১০ হাজার জনে একজনের এই রোগ থাকে।

**রক্ত দেওয়ার নিয়ম :** ইচ্ছে থাকলেও যে কেউ রক্ত দিতে পারবেন, তা নয়। যেমন—দাতার কোনও ছোঁয়াচে বা রক্ত দ্বারা বাহিত হতে পারে এমন অসুখ থাকলে, তিনি রক্ত দিতে পারবেন না। এছাড়া এডস, হার্টের রোগ, হইপারটেনশন, ক্যানসার, এপিলেপ্সি, কিডনির অসুখ ও ডায়াবিটিস থাকলে রক্ত দেওয়া নিষেধ। যাঁদের অ্যানিমিয়া রয়েছে তাদের রক্ত দেওয়া নিষেধ। হিমোগ্লোবিন যদি ১২.৫-এর নীচে হয়, তাহলে রক্ত দেওয়া যবে না। পালস রেট যদি ৫০-এর কম ও ১০০-এর বেশি হয়, তাহলেও রক্ত নেওয়া হয় না। এছাড়া, হাঁপানি, টিবি বা কোনও ধরনের অ্যালার্জি থাকলেও রক্ত নেওয় হয় না।

**বয়স ও ওজন :** দাতার বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। কম পক্ষে ৫০ কেজি ওজন না হলে রক্ত দেওয় বারণ। রক্ত দেওয়ার সময় দৈহিক তাপমাত্রা থাকতে হবে ৩৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রক্তচাপের সিস্টোলিক থাকতে হবে ১০০-১৮০, ডায়াস্টোলিক ৫০-১০০।

**বিধিনিষেধ :** ট্যাটু বা পিয়ার্সিং করানোর ছ'মাসের মধ্যে রক্ত দেওয়া যবে না। রেবিজ, হেপাটাইটিস বি টিকা নেওয়ার ছ'মাস পরে রক্তদান করা উচিত। তবে কোভিডের টিকা নেওয়ার দু' থেকে তিন সপ্তাহ পর রক্ত দান করা যেতে পারে বলে কোনও কোনও ডাক্তারের মত। রক্তদান করর আগের ২৪ ঘণ্টায় মদ্যপন করা চলবে না। গর্ভবতী বা সদ্য মা হয়েছেন এমন মহিলা রক্তদান করতে পারেন না। এছাড়া, মিসক্যারেজ হওয়ার ছ'মাসের মধ্যে রক্তদান নিষিদ্ধ। □

# মানুষ হারাতে বসেছে তার কন্ট্রোল রুম

**নিখিল চিত্রকর**

একটা মোবাইল ফোনের জন্য নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছিল বেলদার তরতাজা কিশোর আকাশ সাউ। বছরখানেক আগের ঘটনা। সময় পেলেই বন্ধু-বান্ধবদের মোবাইলে গেম খেলতো ১৩ বছরের আকাশ। তবে অনেক সময় বন্ধুদের ভিড়ের মাঝে মোবাইল হাতে পাওয়ার সুযোগ জুটতো না। একদিন বাড়িতে মোবাইল কেনার বায়না ধরলো সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়াটি। মোবাইল ফোন কিনে না দেওয়ায় কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হয় আকাশ।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে চণ্ডীপুরেও। পড়াশোনা শিকেয় তুলে দিনরাত দাদার মোবাইলে গেম খেলে বেড়াতো চন্দ্রকান্ত মণ্ডল। তা নিয়ে মা ও দাদা আপত্তি তোলায় তাঁদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় বছর ষোলোর কিশোর। অকুস্থলেই মারা যায় তার দাদা। পাড়াপড়শিরা ছুটে এসে উদ্ধার করেন আহত মা-কে। ঘটনার আকস্মিকতা সামলাতে না পেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে চন্দ্রকান্ত। এভাবেই মোবাইলের নেশায় বুঁদ হয়ে আরো কত আকাশ কত চন্দ্রকান্ত নিজেদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিদিন। একটা সময় ‘ড্রাগের নেশা সর্বনাশা’ বলে যে স্লোগানে যুব সমাজের প্রতি সতর্কতা জারি করা হতো, এখন সেটাই এসে দাঁড়িয়েছে ‘মোবাইলের নেশা সর্বনাশা’ সতর্কতায়।

নববই দশকের শেষে দিকেও মোবাইলের তেমন বাড়বাড়ন্ত ছিল না আমাদের সমাজে। তখন পাড়ার রকে বসে আড্ডা যেমন চলতো, তেমনি বাড়ির কচিকাঁচারাও মেতে উঠতো নানা ইন্ডোর আউটডোর গেমে। লোডশোডিং হলে সবাই মিলে গানের লড়াই চলত। আর এখন মানুষ বড়ো বেশি একপেশে। মোবাইল আর সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের একমুখীনতায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জীবন লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারে বন্দি হয়ে গেছে। ফোর-জি, ফাইভ-জি’র ট্রেন্ডিং গতিতে বড়ো বেশি অসামাজিক হয়ে পড়ছে কি মানব সমাজ? অধিকাংশ বাড়ির ছবিটাই মোটামুটি একরকম। কেউ মুখের কথা খরচ করে না। মোবাইল ফোন নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকে।

বেশিরভাগ মানুষই তুচ্ছ কারণে মেজাজ হারাচ্ছেন। ধীরে ধীরে একাকিত্বের অতল সাগরে ডুবে যাচ্ছেন তাঁরা। স্বাভাবিকভাবে অন্যদের সঙ্গে মিশতে পারছেন না। মোবাইল ফোনের ইন্টারনেট সমাজমাধ্যমের দৌলতে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই বাড়তি মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রবণতা বাড়ছে। মনোবিদদের মতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে বেশিরভাগ শিশুই এখন শৈশব থেকে হাতে মোবাইল ফোন পেয়ে যাচ্ছে। ফলে গেম খেলা কিংবা ভিডিয়ো দেখার শখ তৈরি হচ্ছে কাঁচা বয়সেই। এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে দেখেছিলাম, তাদের বাড়ির ৫ বছরের শিশুটিও ইউটিউবে ভিডিয়ো না দেখলে খেতে চায় না। সব দোষ আসলে শিশুদের নয়, আমাদের উপরেও বর্তায়। ইদানীং ধৈর্য আর সময়ের অভাবে শিশুদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে গল্প করে খাওয়ার রেওয়াজটাই চলে গেছে। সেক্ষেত্রে মুঠো ফোনে অডিয়ো-ভিডিয়ো দেখলে বাচ্চারা সহজেই ভুলবে। টোটকাটা সহজ। কিন্তু পরিণতি মারাত্মক সুদূর প্রসারী। এখনকার ভিডিয়োগেম মানে ফ্রি-ফায়ার অথবা পাবজি। কিছু কিছু গেম দুর্দান্ত

অ্যাকশন ও ভায়োলেন্সে ভরা। বেশিরভাগ সময় এই গেমদুনিয়ায় কাটানোর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চাদের মধ্যে একটা হ্যালুসিনেশন তৈরি হয়। বেলদার আত্মঘাতী আকশ সাউ কিংবা চণ্ডীপুরের চন্দ্রকান্ত এই মোবাইল ফোনের হ্যালুসিনেশনেরই শিকার।

দেশ-বিদেশের একাধিক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে মোবাইলের নেশা অন্যান্য নেশার মতোই ভয়ংকর হতে পারে। কারণ অন্যান্য নেশার মতোই মোবাইল আসক্তি মানুষের অনুভূতির উপর প্রভাব ফেলছে। অন্য নেশা থেকে বেরিয়ে আসাটা যেমন কঠিন, তেমনই মোবাইলের নেশা ছাড়ানোও সহজ নয়। তাই বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন অভিভাবকদের উচিত ছোটো থেকেই মোবাইল ফোনের সঙ্গে বাচ্চাদের একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা।

চিকিৎসকদের মতে, শরীরের উপর মোবাইল ফোনের যতটা ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে, তার থেকেও বেশি প্রভাব পড়ে মন ও মস্তিষ্কের উপর। মনে রাখতে হবে, আমাদের পুরো শরীর, তার মধ্যস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কোষ, কলা সমস্ত কিছুর কন্ট্রোলরুম কিন্তু ওই মস্তিষ্ক। সেই কন্ট্রোল রুমটাই কিন্তু ক্রমশ হাতছাড়া হচ্ছে। অন্তত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণার দাবি তেমনটাই। বিশ্বের ভুরি ভুরি কেস স্টাডি জানাচ্ছে মোবাইল আসক্তিজনিত মানসিক সমস্যা বহুদিন চলতে থাকলে তা দীর্ঘমেয়াদি জটিল অসুখের কারণ হতে পারে। আসতে পারে মানসিক অবসাদ।

সম্প্রতি রাজস্থানের জয়পুরের একটি হাসপাতাল দেশজুড়ে শিশুদের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। তা থেকে প্রাপ্ত তথ্যতে চিকিৎসকরা প্রমাদ গুনছেন। সমীক্ষা অনুযায়ী, বর্তমানে ৬৫ শতাংশ শিশু স্মার্টফোনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তারা আধঘণ্টার বেশি স্মাটফোন ছেড়েই থাকতে পারছে না। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে এই স্মার্টফোন। সমীক্ষায় প্রকাশ, ফোন ছাড়তে বলা হলে শিশুরা রেগে যাচ্ছে, কাঁদতে শুরু করছে। এমনকী চিৎকার করে রাগ-বিরক্তি প্রকাশ করছে। পরবর্তী পর্যায়ে সমীক্ষাটি কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই ও চণ্ডীগড়েও চালানো হয়। দেখা যাচ্ছে মোবাইলে আসক্ত শিশুদের বেশিরভাগেরই আচরণগত সমস্যা প্রকাশ পাচ্ছে। ২৩.৯ শতাংশ তাদের নিয়মিত রুটিন এড়িয়ে যাচ্ছে। ২০.৯ শতাংশের জীবনযাপন একেবারে দায়সারা হয়ে গেছে। ৩৬.৮ শতাংশ বাচ্চা একগুঁয়ে আচরণ করছে। আর ১৭.৪ শতাংশ শিশু কোনো জিনিসেই বেশিক্ষণ মন দিতে পারছে না।

যেসব শিশুর মধ্যে সমীক্ষা চালানো

হয়েছিল তাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ ছেলে ও ৪৫ শতাংশ মেয়ে। তথ্যানুযায়ী ল্যাপটপ, ট্যাব, মোবাইল, কম্পিউটারের মধ্যে বাচ্চারা মোবাইলের ব্যবহারটাই সবচেয়ে বেশি করে। কোভিড পরিস্থিতির দরুন এমনিতেই অনলাইন ক্লাসের জন্য শিশুদের ১ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাটাতে হয়। তার উপর লকডাউনের ঘরবন্দি থাকার সময় প্রায় সমস্ত শিশুরই 'স্ক্রিন টাইম' (মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদির পর্দায় তাকিয়ে থাকার সময়) বেড়ে গেছে দুই থেকে তিন গুণ।

মোবাইলের প্রতি আসক্তির ফলে সমস্যা হচ্ছে ঘুমেরও। অর্ধেকের বেশি শিশুর শুয়ে পড়ার পরে ২০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা অবধি ঘুম আসছে না। ১৭ শতাংশ শিশুর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। যার দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি ইলসমলিয়া বা অনিদ্রা রোগ। অনিদ্রার দীর্ঘ সূত্রতা কিন্তু ডেকে আনতে পারে সেরিব্রাল স্ট্রোকের মতো গুরুতর বিপদ। একই কারণে এদেশের কচি-কাঁচাদের মধ্যে সেরিব্রাল স্ট্রোকের প্রবণতা বাড়ছে।

দু' বছর আগেই সারাবিশ্বে হাড়হিম করা একটি মোবাইল গেমের আমদানি হয়েছিল। ব্লু হোয়েল। গেমের একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে ছেলে-মেয়েরা আত্মহত্যা করতো। ব্লু হোয়েলের পর মোমো বলে আরও একটি গেম এসেছিল বাজারে। সেখানেও স্কুল কলেজের বহু পড়ুয়াকে আত্মহত্যা করতে দেখা গেছে। এক মনোবিজ্ঞানীর কথায়, এই ধরনের বিভিন্ন ভার্চুয়াল কনটেস্ট ছেলে-মেয়েদের মন ও মস্তিষ্কে একটা অন্য জগৎ তৈরি করতে সক্ষম। গেমের এক একটা ধাপ যখন কেউ পেরোতে থাকে, তখন তার মধ্যে জয়ের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। এই সময় গেমিং অ্যাপের নোটিফিকেশনের নির্দেশ অনেকটা রোবটের মতোই পালন করে খেলোয়াড়। নিজের আবেগ বা মননের উপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। চারপাশটা একটা বিভ্রমের মতো তৈরি হয়। সেই সময় সে কী করছে বা করবে, তার জ্ঞান থাকে না।

এতো গেল শিশু-কিশোর বয়সের কথা। স্মার্টফোনের সর্বনাশা প্রভাব থেকে ছাড় পাচ্ছে না প্রাপ্ত বয়স্করাও। স্মার্টফোনের অডিয়ো-ভিসুয়াল, ফিচার, বিভিন্ন ইন্টারনেট সামাজিক মাধ্যমের চোরা বালিতে ডুবে যাচ্ছে মানব সমাজ। বিচ্ছিন্ন এ সমাজের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া এখন পূরণ করে ভার্চুয়াল জগৎ। এই জগতের বৃহত্তর বাসিন্দারা নেটিজেন বা নেট নাগরিক বলেই পরিচিত। স্মার্টফোনে থাকা গুগল-অ্যাপ নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন। কিন্তু ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টিকটক, স্ন্যাপচ্যাটের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের ভালো কোনো প্রভাব এখনোও দেখা যায়নি। ফেসবুকের বিভিন্ন কনটেস্ট, ট্রেডিং ভিডিয়ো, ভাইরাল তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে এই সমস্ত অ্যাপে বন্ধুত্ব পাতানোর নামে প্রতারণার ফাঁদ পেতে রাখছে এক শ্রেণীর কুচক্রী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিকবার প্রতারিত হয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার পর চোখ খোলে মানুষের। দূর-দূরান্তের অচেনা প্রোফাইল থেকে আসা বন্ধুত্বের অনুরোধে নির্দ্বিধায় সাড়া দিচ্ছেন গৃহবধূরা। সেগুলোর পরিণতি যে খুব একটা ভালো হয় না, তা সংবাদমাধ্যমে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। তবুও কী সতর্ক হচ্ছি আমরা? হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যমে যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেলিং থেকে শুরু করে ভায়োলেন্স, অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। আগে বাড়িতে চারজন বসে লুডো খেলা হতো। এখন অচেনা, অজানা ব্যক্তির অনুরোধ আসে ফেসবুকে লুডো খেলার জন্য। এখানেও লুকিয়ে থাকে প্রতারণার ফাঁদ। নিষিদ্ধ বস্তুতেই আসক্তি বাড়ে আমাদের। প্রত্যেক বিষয়েরই ভালো-মন্দ দিক থাকে। স্মার্টফোনের ভালো দিকটা বস্তাচাপা দিয়ে নেটসমাজ মন্দটাকেই বেছে নেওয়ার তাগিদ দেখিয়েছে এখনো পর্যন্ত।

# মোবাইল ফোন নির্গত বিকিরণে শিশুস্বাস্থ্যে কুপ্রভাব

**ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য**

‘ভূতুড়ে পকেট কাঁপা লক্ষণ’ (Phantom pocket vibration Syndrome)-এর নাম শুনেছেন! না শুনলেও প্রায় ৮৯ শতাংশ কিশোর-কিশোরী এই লক্ষণ অনুভব করে থাকে, এমনকী সময় সময় বহু শিশু এবং বড়োরাও এই লক্ষণ অনুভূতির শিকার। দেখবেন বহু সময় পকেটে মোবাইল ফোন চালু না থাকলেও মনে হয় মোবাইল বুঝি কাঁপছে বা বাজছে— এই ব্যাপারটাকেই Phantom pocket vibration Syndrome বলা হয় যা অত্যধিক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তদের মধ্যে দেখা যায়। তারা সাধারণত বেশি উদ্বিগ্ন এবং নার্ভাস প্রকৃতির এবং অন্য কারোর পাঠানো টেক্সট মেসেজগুলির (Text message) একটিও বাদ পড়া তাদের কাছে খুবই উদ্বেগের।

আসলে মোবাইল বা সেল ফোনের মতো এত জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রয়োজনীয় দিকটি আমরা সাদরে গ্রহণ করলেও মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সচেতন নই। সারা বিশ্বে মোবাইল ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলি নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে, পরস্পর বিরোধী অনেক তথ্যও উঠে আসছে তবে মোটের উপর শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর মোবাইল ফোন ব্যবহারের যে অনেক সুদূর প্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব আছে তা আজ প্রমাণিত।

মোবাইল ফোন থেকে এক ধরনের নন-আয়োনাইজিং বিকিরণ (Non-ionizing radiation) নির্গত হয় যা আসলে কম শক্তি সম্পন্ন, স্বল্প কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গের স্রোত বা Radio-frequency wave যার মাধ্যমে মোবাইলের প্রেরক যন্ত্র অর্থাৎ এন্টেনার সাহায্যে নিকটবর্তী মোবাইল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। যখনই আমরা মোবাইল ব্যবহার করি তখনই আমাদের ফোন সেই বেতার কম্পাঙ্কের স্রোত মোবাইল টাওয়ার থেকে অ্যান্টেনার মাধ্যমে গ্রহণ করে।

মোবাইল ফোন থেকে নির্গত বেতার তরঙ্গের স্রোত তথা মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ যে সকলের জন্য বিশেষ করে শিশু ও গর্ভস্থ ভ্রূণের জন্য অতি ক্ষতিকর সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। বহু গবেষক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে এই জাতীয় বিকিরণ শিশু ও ভ্রূণের স্বাস্থ্যের জন্য বড়োসড়ো ঝুঁকির কারণ। শিশুদের মাথার খুলি (Skull) বড়োদের তুলনায় ছোটো, পাতলা এবং তাদের মস্তিষ্কের কলাসমূহ (Brain tissues) বেশি শোষক হওয়ায় তারা অধিকতর মাইক্রোওয়েভ শোষণ করতে পারে। গর্ভস্থ ভ্রূণের ঝুঁকি আরও বেশি কারণ মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ তাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের আবরণ ঝিল্লির অবক্ষয় ঘটাতে সক্ষম।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে বড়োদের তুলনায় শিশুদের মস্তিষ্ককলা দুইগুণ বেশি এবং অস্থিমজ্জা দশগুণ বেশি মাইক্রোওয়েভ শোষণ করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম-সহ বেশ কিছু প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত দেশের সরকার শিশুদের মোবাইল ও বেতার বা ওয়্যারলেস যন্ত্র ব্যবহারের উপর আইন প্রণয়ন কিংবা বেশ কিছু নির্দিষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করার নির্দেশ জারি করেছে। শুধু তাই নয়, সেসব দেশে স্মার্ট ফোন প্রস্তুতকারীদের বিধিসম্মত ভাবে জানাতে হবে যে ন্যূনতম কতটা দূরত্ব শরীর থেকে মোবাইল ফোনের মধ্যে রাখলে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের বৈধ সীমা লঙ্ঘন করবে না। সাধারণত এই দূরত্ব ২০ সেমি বা ৮ ইঞ্চি।

সেল ফোনের অত্যধিক ব্যবহার শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের

উপর ভালো রকম ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠতে পারে— বিশেষ করে কম আই কিউ এবং অসম মানসিক বৃদ্ধি, কম ঘুম, মস্তিষ্কের টিউমার এবং মানসিক রোগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা শিশুদের হতে পারে। সেল ফোনের ব্যবহার ক্যানসারের কারণ কিনা সে ব্যাপারে এখনও আমাদের হাতে সংশয়াতীত তথ্য না থাকলেও আমাদের শরীরে বিশেষ করে বাড়ন্ত বাচ্চা, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে সেল ফোনের বিকিরণ ভবিষ্যতে যে ব্রেন টিউমার ও কানের নার্ভের টিউমার সৃষ্টি ত্বরান্বিত করতে পারে— বিভিন্ন গবেষণায় সে ইঙ্গিত মিলেছে।

আমেরিকার পিউ রিসার্চ সেন্টার একটি রিপোর্টে জানিয়েছে যে প্রায় ৭৫ শতাংশ বালক বালিকা এবং কিশোর-কিশোরী (যারা বয়ঃসন্ধিকালে রয়েছে) সারাদিন তাদের সেল ফোন প্যান্টের সামনের পকেটে রাখে যা তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের (Reproductive health) পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। মেয়েদের অন্তর্বাসের মধ্যেও সেলফোন রাখা উচিত নয়। ছেলেদের শুক্রাণু ও মেয়েদের স্তনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে এ ধরনের অভ্যাসগুলি।

মোবাইল ফোনের অত্যধিক ব্যবহার প্রাথমিকভাবে শিশুদের এবং সাধারণভাবে বড়োদের স্বাস্থ্যের উপর নীরবে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব রেখেই চলেছে। আমরা বিবিধ প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে সবসময় অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত ও সহজলভ্য হবার জন্য লড়ে যাচ্ছি এই সেল ফোনের মাধ্যমে— যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ, উদ্বেগ ও মনঃসংযোগহীনতা ঘটিয়ে চলেছে নিরন্তর। আমরা ভুলে যাই যে আমাদের পকেটেই রয়েছে এই সকল কারণগুলির উৎস। এমনকী ঘুমানোর সময়ও অনেকে বালিশের পাশে রাখে তাদের সাধের মোবাইল। দিনের বহু সময় মাথা নীচু করে এক দৃষ্টিতে মোবাইল ব্যবহারের ফলে বাচ্চা ও শিশুদের চোখের উপর খুবই চাপ পড়ে। ফলে বেড়ে যায় তাদের চোখ শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা যা হয়ে উঠতে পারে তাদের দৃষ্টিশক্তি হারানোর অন্যতম কারণ। তাই পরিষ্কার দেখার জন্য চোখের থেকে সেল ফোনের অন্তত ১২-১৬ ইঞ্চির দূরত্ব রাখা উচিত।

শুধু তাই নয়, বাড়ন্ত বয়সীদের প্রতিদিন ঘাড় নীচু করে মোবাইল ব্যবহার করার ফলে ঘাড় ও গলার মেরুদণ্ড ও পেশিসমূহের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে— যার থেকে পিঠে, ঘাড়ে ও মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে মারাত্মক শারীরিক অসুবিধা তাদের গ্রাস করতে পারে।

আজ কারণে অকারণে সহজলভ্য সেলফোনে শিশু থেকে টিন এজার সকলকে যেমন অনেক আধুনিক করে দিয়েছে, জ্ঞানের ভাণ্ডার এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয় ঠিক তেমনই খেলাধুলা ও মাঠ থেকে তাদের সরিয়ে দিয়ে শরীরচর্চা বিমুখও করে তুলেছে ব্যাপকভাবে। উঠতি বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ কেউ মোবাইল ফোন পরীক্ষাকেন্দ্রেও নিয়ে যায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য। নিষিদ্ধ দুনিয়ার প্রবেশাধিকারও কেউ কেউ পেয়ে যায় সেল ফোনের মাধ্যমে— হয়ে ওঠে অসামাজিক ও নিষিদ্ধ বস্তুতে আসক্তির শিকার।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মোবাইল তথা সেল ফোনের ক্ষতিকর দিক থেকে ছোটোদের রক্ষা করতে হলে বড়োদের অর্থাৎ মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে সকল অভিভাবকদের বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে, জানতে হবে সেল ফোন নিঃসৃত মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের প্রভাব থেকে বাঁচার নিরাপদ উপায়গুলি। কিছু নিরাপদ উপায় অবলম্বন করলে মোবাইলের ক্ষতিকর বিকিরণ থেকে অনেকটাই নিস্তার পাওয়া যেতে পারে। যেমন—

(১) অকারণে এবং যখন তখন সেল ফোন ব্যবহার করা চলবে না।

(২) বিকিরণের প্রভাব এড়াতে অকারণে সারাক্ষণ সেল ফোন চালু না রেখে ব্যবহারের সময়টুকু বাদ দিয়ে যতটা সম্ভব তা বন্ধ (সুইচড অফ) রাখতে হবে।

(৩) মোবাইল ফোনটি শরীরের সংস্পর্শে যতটা সম্ভব কম রেখে তা দূরে রাখতে হবে।

(৪) কোনো অবস্থাতেই জামা প্যান্টের পকেটে বা অন্তর্বাসের ভিতরে মোবাইল রাখা উচিত নয়।

(৫) ঘুমানোর সময় বালিশের নীচে বা পাশে মোবাইল রাখা কখনই উচিত নয়।

(৬) শিশুদের ও গর্ভবতী মায়েদের যতটা সম্ভব সেল ফোন ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত। সাধারণভাবে ১৬ বছরের নীচের বাচ্চাদের সেল ফোন যত কম ব্যবহার করতে দেওয়া যায় তত মঙ্গল। এমনকী বাচ্চাদের সান্নিধ্যে বড়োদেরও যথাসম্ভব সেল ফোনের ব্যবহার না করাই ভালো।

(৭) মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের থেকে চোখের দূরত্ব ন্যূনতম ১২-১৬ ইঞ্চি এবং আইপ্যাড, ল্যাপটপ, কম্পিউটার ও ট্যাবলেট থেকে চোখের দূরত্ব কম করে ৮ ইঞ্চি রাখা উচিত।

(৮) স্বল্প আলোতে বা রাত্রে একটানা দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা চলবে না।

(৯) মোবাইল ফোন কিংবা যে কোনো ওয়্যারলেস (বেতার) যন্ত্র ব্যবহারের সময় ইয়ার ফোন সেট (Ear Phone Set) কিংবা হেড ফোন সেট (Head Phone Set) দিয়ে ব্যবহার করা উচিত কারণ কানের থেকে মোবাইলের দূরত্ব কয়েক ইঞ্চি বাড়লেই বিকিরণের ঝুঁকি হাজার গুণের বেশি কমে যায়।

(১০) সর্বোপরি, অকারণ ও অত্যধিক মোবাইল ব্যবহারে বিকিরণজাত ক্ষতিকর প্রভাব এবং সামাজিক প্রভাব সম্বন্ধে ছোটোদের ভালো করে, যুক্তি দিয়ে ও ধৈর্য্য সহকারে বুঝিয়ে এবং তথ্য প্রযুক্তির সুফল দিয়েও তাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। ■

ফ ঃ ৪

# এপাং ওপাং হাম্বা হাম্বায় বাংলা অ্যাকাডেমির কুর্নিশ

**জাহ্নবী রায়**

তিনি বাংলা অ্যাকাডেমির পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। তাঁর এপাং-ওপাং-হাম্বা-হাম্বা জনমানসে এতটাই দাগ কেটেছে যে নিজেকেই নিজে সম্মানিত করতে বাধ্য হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর জ্ঞানের পরিধি জগত জোড়া। তিনি একাধারে চিত্রকর। ভারতের আর কারোর ভাগ্যে ছবির জন্য কোটি টাকা জুটুক না জুটুক তাঁর ছবি কিন্তু বিকিয়েছে কোটি টাকায়। এখনোও পর্যন্ত অনেক নতুন তথ্যের আবিষ্কারক তিনি। সে দেবদেবী হোন বা মহাত্মাজীর অনশন ভঙ্গ করতে পরলোক থেকে নেমে এসে বিশ্ব কবির ফলের জুস খাওয়া পর্যন্ত, সবেতেই তিনি সিদ্ধহস্ত নতুন নতুন তথ্য দিতে পারদর্শী। এহেন রাজ্যের সুপ্রিমোকে এর আগে কেউ দেখেছেন কিনা ইতিহাস বলতে পারবে না। তবুও নিন্দুকেরা যতই আড়ালে আবডালে বাজে কথা বলুক না কেন, তিনি কিন্তু ইতিমধ্যে একশোর (১১৩টি গ্রন্থ) উপর পুস্তকের রচয়িতা। তিনি সুরের এত বড়ো সাধক যে সদ্য প্রয়াত সন্ধ্যা থেকে বাপীদা, সবাই নাকি তাঁর শরণাপন্ন হতেন। যাই হোক, তিনি সুপ্রিমো, তিনিই বলবেন রাজ্যের শেষ কথা।

আসা যাক আগের কথায়। তিনি তিন বছরের জন্য বাংলা অ্যাকাডেমির এই সম্মান পেলেন। যদিও এটি (ইতিহাস বলে) তাঁর কাছে এযাবৎ পাওয়া যত সম্মান আছে, তাঁর মধ্যে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এদিন নিন্দুকেরা প্রশ্ন তোলেন যে, কে তাঁর নাম প্রস্তাব করল, আর কোন নির্বাচক মণ্ডলীর বিচারে তিনি এই সম্মান পেলেন? অবশ্য আজকে এই সময়ে দাঁড়িয়ে চাটুকার সাহিত্যিক ও লেখকদের এইসব শব্দ না বলাই ভালো।

বাংলা অ্যাকাডেমির সম্মান নিয়ে এর আগের সরকারের আমলেও রাজনীতি, স্বজন পোষণের অভিযোগ যে ওঠেনি তা নয়। সেদিন কিন্তু এক শ্রেণীর সাহিত্যিক মেরুদণ্ড সোজা করে প্রতিবাদ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে এই সম্মান প্রদান প্রসঙ্গে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বলেই ফেললেন যে এটি আবার নাকি সমাজ কল্যাণ ও সমাজ সেবকদের জন্য। যাই হোক, নিন্দুকেরা বলছেন, যে দপ্তরের মন্ত্রী সুপ্রিমো স্বয়ং, সেই

**এপাং ওপাং ঝপাং**
মমতা ব্যানার্জী

এপাং ওপাং ঝপাং
আমরা সবাই ড্যাং ড্যাং
চলো দেখি কোলাব্যাঙ
প্রজাতির আছে কি ঠ্যাং?

এপাং ওপাং ঝপাং
সুর ধরেছে পটাঙ
ব্যাঙ ডাকে গ্যাঙ গ্যাঙ
হাতির কতো বড় ঠ্যাং।।

দপ্তরের পুরস্কার নিতে গিয়ে লজ্জা করল না। প্রসঙ্গক্রমে রাজ্যের শাসক দলের নেতা সমেত একদল চাটুকার ও তোষামোদি সাহিত্যিককুল আবার চার্চিল ও বাজপেয়ীকে তুলনাবশত টেনে এনেছেন। তাঁদের কাছে প্রশ্ন, তাঁরা কি জানেন বাজপেয়ী বা চার্চিলের সাহিত্য সাধনার কথা? এক দেড়ো শিল্পীর কথা সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ আসছে, তিনি আবার কাকের মতো কাকা করেন, তিনি নাকি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে, নিজের হাতে পুরস্কৃত করতেন এই লেখিকাকে। তবে এই বাক্যের সত্যতা যাচাই করে দেখার সুযোগ হয়নি লেখকের, এর সঙ্গে দেখার সুযোগ হয়নি, বাংলা অ্যাকাডেমির বর্তমান সভাপতির (ব্রাত্য বসু) একটি উক্তি, বাংলা ভাষার লোক ছাড়া অন্য ভাষার মানুষেরা এভাবে সমালোচনা করত না। যদি তিনি এই কথা বলে থাকেন, তাহলে বাঙ্গালিকে এর থেকে বড়ো অপমান আর কেউ কি করতে পারেন? এই প্রসঙ্গে আসে এক কবির কথা। অনেক নিন্দুক বলেন, তিনি কবিবর হিসেবে কল্কে পেয়েছিলেন স্ত্রী ভাগ্যে। অতি বড়ো বাম থেকে আজ অতি বড়ো মূল। তিনি আবার বাংলা অ্যাকাডেমির বকলমে হর্তা কর্তা বিধাতা। তিনিই নাকি সিংহভাগ ঠিক করেন। এখানে আবার নির্বাচকের তালিকায় আছেন প্রথিতযশা অনেক প্রণম্য লেখক থেকে সাহিত্যিক। তাঁরা অনেকটাই আলংকারিক হিসেবে আছেন কমিটিতে। অনেকটাই লোক দেখানো। নানা সম্মাননা প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের মতের গুরুত্বই দেওয়া হয় না। এমনটাই জানাচ্ছে একটি বিশেষ সূত্র।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০ মে ১৯৮৬ সালে। ১৯৯৪ সালে এটি স্বশাসিত সংস্থার মর্যাদা পায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে সরকারি ভাবে কাজ করে এই সংস্থা। বর্তমান সভাপতি ব্রাত্য বসু। প্রথম সভাপতি ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, আর সম্পাদক ছিলেন সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়। পরিচালিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ দ্বারা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মানিত করে অ্যাকাডেমি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা সুপ্রিমোর এই সম্মাননা প্রাপ্তি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রোল আর মিম এর বন্যা। অনেকে বলছেন যে, নোবেল সম্মান থেকে একহাত দূরে তিনি। ম্যাগসেসাই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তিনি, কেউ আবার লিখছেন যে তিনি নাকি এক নতুন ধারার ছন্দের প্রবর্তক। যেখানে টাক এর সঙ্গে ঢাক, ছন্দে মেলানো হয়। এরকম অনেক কিছুই। অবশ্য এর মধ্যেই অনেকে আবার ব্যঙ্গ করে বলছেন দু'কান কাটা মানুষেরা বাজারের মধ্যখান দিয়ে গেলেও, কোনো শব্দ তাঁদের কানে ঢোকে না। ■

# স্বাধীনতার ৭৫ স্মরণে রামপুরহাটে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা প্রদান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা মধ্যবঙ্গ প্রান্তের বিভাগের ব্যবস্থাপনায় উত্তর বীরভূম জেলার রামপুরহাট নগরে তথা জেলা কার্যালয়ে গত ৫, ৬ মার্চ আয়োজন করা হয় একটি নিশুল্ক চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান শিবির। আবার গত ২৪ এপ্রিল ৩৭০ জন দরিদ্র মানুষকে বিনা মূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। আনমোল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর আর্থিক সহযোগিতায় কলকাতার প্রখ্যাত শঙ্কর নেত্রালয়ের চিকিৎসকদের দ্বারা এই শিবিরটি সাফল্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই শিবিরে উত্তর বীরভূম জেলার প্রায় ৫০টি গ্রাম এবং ২টি নগরের মোট ৫২০ জন দরিদ্র মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। চক্ষু পরীক্ষার পর প্রায় ৫০ জন রোগীকে কলকাতার শঙ্কর নেত্রালয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের চোখের ছানি অপারেশন করিয়ে সুস্থ করে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়। শিবির চলাকালীন সমস্ত রোগীর জন্য জল ও বিস্কুটের ব্যবস্থা করা হয়। এর সঙ্গে করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মাস্ক, স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা হয়। শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক গৌতম কুমার নিয়োগী, নগর সঙ্ঘচালক উৎপর চ্যাটার্জি, আনমোল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর Sr Executive Csr প্রিয়ধন দে, শঙ্কর নেত্রালয়ের ডাক্তারবাবু পঞ্চানন ঘোষাল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কার্যকর্তাগণ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামীদিনেও সারা বছর বিভিন্ন সেবা কাজের সঙ্গে চক্ষু শিবির জেলার বিভিন্ন স্থানে করা হবে। যাতে অধিকাধিক অসহায় মানুষের কাছে এই সেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। এই শিবিরের চিকিৎসা পেয়ে রোগীরা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং অনেকে আগামীদিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে থেকে এই ধরনের সেবা কাজে নিজেকে শামিল করতে চান।

# বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের প্রধানাচার্য সম্মেলন

গত ৩০ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু বিদ্যামন্দিরে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের বার্ষিক প্রধানাচার্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিদ্যাভারতীর কেন্দ্রীয়

সমিতির সদস্য জেএম কাশীপতি, রবীন্দ্র চামারিয়া, ক্ষেত্রীয় সংগঠন মন্ত্রী দিবাকর ঘোষ, ক্ষেত্রীয় সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত রাণা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় প্রচারক রমাপদ পাল, প্রান্ত সভাপতি রবিরঞ্জন সেন, প্রান্ত সম্পাদক তপন কুমার ভড়, প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী-সহ প্রান্তের ১২২ জন প্রধান আচার্য/আচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বর্গে বর্তমান ও আগামী শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। যেমন— রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০, লক্ষ্যবর্ষ ২০২৫, বার্ষিক যোজনা, বিভিন্ন শৈক্ষিক বিষয়। সম্মেলনে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ভগবতী প্রসাদ জালান, বিষ্ণু ফোগলা, সতীশ ঝুনঝুনওয়ালা। কাশীপতিজীর আশীর্বচনের মাধ্যমে এই পর্বের সমাপ্তি হয়।

# ভঁওরলাল মল্লাবত সেবা কেন্দ্রের স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপন

গত ৪ মে কলকাতার সেবা সংস্থা ভঁওরলাল মল্লাবত সেবা কেন্দ্রের ২৩তম স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপন করা হয় সেবাকেন্দ্রের সভাকক্ষে। সেবাকেন্দ্রের নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি মহাবীর বজাজ বলেন, অসহায় ও পীড়িত মানবতার সেবা এক প্রকার রাষ্ট্রসেবা। এই কাজ এই সেবাকেন্দ্র করে চলেছে। সেবাকেন্দ্রের সভাপতি রামগোপাল সুংঘা বলেন, স্বর্গীয় ভঁওরলাল মল্লাবতের সম্পূর্ণ জীবন কর্মময় ও সেবাভাবী ছিল। তাঁর নামে এই সেবাকেন্দ্র ২২ বছর পূর্ণ করে ২৩ বছরে প রাখলো। সেবাকেন্দ্রের সম্পাদক সত্যনারায়ণ মোরীজওয়ালা সেবাকেন্দ্রের কাজে সবাইকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। ডাঃ বিজয় হরভজনকা, ডাঃ গীতা সিংহ ও রশ্মি গাড়োদিয়া সেবকেন্দ্রের দ্বারা

পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঞ্চালক অরুণ প্রকাশ মল্লাবত। অনুষ্ঠানে সঞ্জয় রাস্তাগী, ডাঃ সুরেশ গুপ্তা, ডাঃ সরিত জয়সোয়াল-সহ বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

# মালদায় সংস্কৃত ভারতীর আলোচনা সভা

সংস্কৃত ভারতী মালদা জেলার উদ্যোগে গত ৫ মে মালদহের টাউন হলে আয়োজিত হয় 'সায়েন্স ইন সংস্কৃত' বিষয়ে এক আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন ইসরোর যুববিজ্ঞানী সুহাস মুখার্জি। এছাড়াও অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক বিবেকানন্দ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক জয় সাহা, সংস্কৃত ভারতীর মালদা জেলার সংযোজিকা শ্রীমতী তাপসী মণ্ডল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিগণ দীপ প্রজ্বলন করেন। সেই অবসরে নীলাক্ষ পাণিগ্রাহী নামে এক শিশু সুন্দর ভাবে দীপ প্রজ্বলন মন্ত্র উচ্চারণ করে। তারপর সুললিত কণ্ঠে সরস্বতী বন্দনা পরিবেশন আর এক শিশু সিবাঙ্গশী পাণিগ্রাহী। এছাড়াও সংস্কৃত সংগীত পরিবেশন করে অঙ্কনা সাহা। সংস্কৃতে স্বাসত বক্তব্য রাখেন সংস্কৃত ভারতীর মালদা জেলা সংযোজিকা শ্রীমতী তাপসী মণ্ডল। বিজ্ঞানেও সংস্কৃত চর্চা আবশ্যক— এ বিষয়ে বলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিবেকানন্দ মণ্ডল। তারপর শুরু হয় এদিনের মূল পর্ব— বিজ্ঞানে সংস্কৃত। ইসরোর যুব বিজ্ঞানী সুহাস মুখার্জি প্রজেক্টারের মাধ্যমে সমস্ত বিষয়টা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন উপনিষদ, বেদ, চরকসংহিতা, সূর্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত পুস্তকে বিজ্ঞানের প্রচুর সূত্র শ্লোক আকারে রয়েছে। আমরা যেখানে সংস্কৃতকে মৃত ভাষা হিসাবে দূরে ঠেলে দিয়েছি সেখানে আজ বিশ্ব সেই সংস্কৃতের মধ্যেই বিজ্ঞান আবিষ্কার করে চলেছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের যেসব আবিষ্কার বলে আমরা জানি সেই সমস্ত কিছুই হাজার হাজার বছর আগে আমাদের মুনিঋষিরা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে লিখে রেখে গেছেন। রসায়ন, পদার্থ, চিকিৎসা, গণিত, কী নেই। মাধাকর্ষণ গতিসূত্র সব কিছুই আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ রয়েছে। এদিনের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সংস্কৃতে সঞ্চালন করেন সংস্কৃত ভারতীর মালদহ জেলার প্রশিক্ষণ প্রমুখ জগদীশ রায়।

# এক নিঃশব্দ বিপ্লবের দিন ফলহারিণী কালীপূজা

**নন্দলাল ভট্টাচার্য**

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ। মহাবিদ্রোহের পনেরো বছরের মাথায় বঙ্গদেশে ঘটল আবার বিপ্লব। তবে নিঃশব্দে। মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে। এবারের বিপ্লবও ঘটল সেই ২৪ পরগনায়, ব্যারাকপুর থেকে বেশ কিছুটা দূরে, গঙ্গাপাড়ে দক্ষিণেশ্বরে।

বিপ্লব যে একটা ঘটছে একথা জানা ছিল না কারও। এই বিপ্লব যে বঙ্গজীবনের এক নবযুগের সূচনা করবে তাও জানতেন না কেউ-ই। এমনকী এই বিপ্লব ঘটে যওয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া বা পরিব্যাপ্তি কতটা হবে সেটাও ছিল অনুমানের বাইরে। এহেন এক বিপ্লব ঘটালেন শ্রীরামকৃষ্ণ, মা ভবতারিণীর অর্চক।

১৮৭৩ বাংলার ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠের অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে। দিনটা ছিল রবিবার, অমাবস্যা। ফলহারিণী কালী পূজা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অন্যান্য বারের মতো সে রাতেও হবে মায়ের পূজা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, এবার পূজা করবেন তাঁরই ভাগ্নে হৃদয়। আরও জানালেন, মন্দিরে নয়, ওই মন্দির চত্বরে তাঁরই ঘরে তিনি নিজে করবেন ফলহারিণী কালীর বিশেষ পূজা। কিন্তু কেমন হবে সে পূজা তার কোনো পূর্বাভাস

পায়নি কেউ। তাই-বা কেন, সেই পূজার সময় ওই ঘরে যাতে কেউ না ঢোকে তারও নির্দেশ দিলেন তিনি। শুধু সারদা দেবীকে বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে তিনি যেন আসেন তাঁর ঘরে।

সেদিনের সেই পূজার প্রাথমিক জোগাড়যন্ত্র করেছিলেন হৃদয়ই। কিন্তু তাঁকেই তো আবার করতে হবে মন্দিরে মা ভবতারিণীর পূজাও। তাই তিনি চলে গেলেন আগেই। জোগাড়ের বাকি কাজে সাহায্য করার জন্য এলেন দীনু পূজারি। রাত ৯টার মধ্যেই শেষ হলো আয়োজন। তাঁকেও চলে যেতে বললেন রামকৃষ্ণ। এ যে তাঁর এক রহস্যপূজা। এ পূজা তিনি করবেন একাই। অন্য কারও সেখানে থাকার অধিকার নেই।

আয়োজন শেষ। এবার শুরু হবে শতাব্দীর এক রহস্যভরা পূজা। রামকৃষ্ণের নির্দেশ মতোই ততক্ষণে এসে গেছেন সারদাদেবীও। কিন্তু তিনি যেন কেমন স্বাভাবিক নন। কী জন্য তাঁকে ডেকেছেন রামকৃষ্ণ তা তিনি জানেন না। কিন্তু অন্তরে উঠেছিল তুফান। তাতে বিচলিত হননি, বরং আত্মস্থই ছিলেন দেবী সারদা। যে কারণেই বাইরের কোনো কিছুই যেন নজরে পড়ছিল না তাঁর। ঘরে ঢোকার সময় থেকেই তিনি এক ভাবলোকবাসিনী।

পূজকের আসনে রামকৃষ্ণ। তাঁর ডানদিকে রয়েছে আলপনা দেওয়া একটি জলচৌকি। সারদাদেবী দেখেও যেন কিছু দেখছেন না। দেখছেন শুধু ঠাকুরের পূজা— মন্ত্রমুগ্ধের মতোই।

শুরু হলো পূজা। আচমন, স্বস্তিবাচন, পুষ্পশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ হলো শেষ। সারা ঘর তখন পরিণত এক দিব্যলোকে। এক সময় রামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে দেবী সারদাকে বললেন, বসতে— তাঁরই ডানদিকে জলচৌকিটির ওপর। কেন বললেন, সে সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা নয়। নীরবে শুধু নির্দেশ পালন।

পূর্বমুখী হয়ে রামকৃষ্ণ বসেছিলেন পুজায়। দেবী সারদা বসলেন উত্তরমুখী হয়ে। সামনে রয়েছে মঙ্গলঘট। তার থেকে জল নিয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করতে করতে বারবার অভিসিঞ্চিত করতে থাকেন দেবী সারদাকে। তিনি তখন স্পন্দনহীন। নিষ্পলক চোখে শুনতে থাকেন রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত মন্ত্র। অভিষেক শেষে পূজা। তার আগে প্রার্থনা— 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিকারী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী। সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্ব কল্যাণ সাধন কর।'

দেবী সারদার সর্বাঙ্গে যথানিয়মে অঙ্গন্যাস, করন্যাস ইত্যাদি করে তাঁকেই দেবী ষোড়শী রূপে শুরু করলেন ষোড়োশোপচারে পূজা। তারপর ভোগ নিবেদন। সেই নিবেদিত ভোগ থেকে কিছুটা তিনি নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন সারদা দেবীকে। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সারদাদেবী হলেন সমাধিমগ্না। রামকৃষ্ণেরও তখন অর্ধবাহ্যদশা। সেই অবস্থাতেই মন্ত্র পাঠ করতে করতে একসময় তিনি সমাধিস্থ হলেন।

ঘরে তখন জ্বলছে নিষ্কম্প দীপশিখা। পূজক এবং পূজিতা দুজনেই বাহ্যজ্ঞানহারা। এক স্বর্গীয় লোকে তখন তাঁদের বিচরণ। সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত এবং একীভূত হলেন সমাধিস্থা দেবী সারদার সঙ্গে।

সময় কাটে। রজনীর দ্বিতীয় প্রহর পার হলো। আস্তে আস্তে কিছুটা যেন বাহ্যজ্ঞানে ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ। এবার যে শেষ করতে হবে মহানিশার এই মহাপূজা। সে এক বিচিত্র অবস্থা তখন তাঁর। সেই অবস্থাতেই আত্মনিবেদন করলেন। তারপর শুধু নিজেকে নয়, সেইসঙ্গে নিজের এতদিনের সাধনা ও সিদ্ধির সব ফল, জপের মালা— সবকিছুই চিরকালের মতো দেবীর চরণে বিসর্জন দিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলতে থাকলেন, —হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্ম নিষ্পন্নকারিণী, হেশরণদায়িনী ত্রিনয়নী শিব-গেহিনী গৌরি, হে নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।'

দেবীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত রামকৃষ্ণ। সাঙ্গ হলো তাঁর 'জগৎ হিতায়' এক দিব্যসাধনা। মূর্তিময়ী বিদ্যাস্বরূপিণী মানবীর শরীরকে দেবীরূপে ঈশ্বরীয় পূজার মধ্য দিয়ে শেষ হলো তাঁর সেই সাধনা। পরিপূর্ণভাবে প্রতিভাত হলো তাঁর দেবমানবত্ব। সবরকমেই সিদ্ধ হয়ে তিনি হলেন অমৃতপুরুষ— অবতারবরিষ্ঠ।

জ্যৈষ্ঠের সেই মহানিশায় রামকৃষ্ণের দৈবচেতনায় রূপান্তর ঘটেছিল। দেবী সারদাকে তিনি ষোড়শী দেবী হিসেবে পূজা করলেন। দশ মহাবিদ্যার তৃতীয় বিদ্যা ষোড়শী। মহামায়ার অঙ্গসম্ভূতা তিনি। তাঁর আবির্ভাব মহামায়ার শতাক্ষী রূপের অবয়ব থেকে এক শুভ মুহূর্তে মহাশক্তির সেই শক্তি পরিচিত হলেন দেবী ষোড়শী নামে।

তবে এই একটি নয়, তিনি বহুনামা। তাঁরই অন্য নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। আবার তিনিই আরাধিতা কোথাও ললিতা, কোথাও রাজরাজেশ্বরী অথবা দেবী ত্রিপুরা নামে। ষোলো বছর বয়সের কিশোরী রূপ তাঁর, তাই তিনি ষোড়শী। বয়স নয়, তিনি সবরকম বাসনার নিবৃত্তি ঘটান বলেই এই নাম। একথা ধর্মীয় আচার্যদের। আবার তাঁর পূজা করা হয় যে বীজমন্ত্রে, তাও ষোলো অক্ষরের।

জবাকুসুমের মতো রাঙা দেবী রক্তাম্বরা। তিনি ত্রিনয়ী, নানা রত্ন ও স্বর্ণাভরণ তাঁর দেহে। তিনি বসে আছেন মহাদেবের নাভি থেকে উত্থিত মহাপদ্মের ওপর বিবিধ রত্নখচিত স্বর্ণসিংহাসনে। দেবী চতুর্ভুজা। তাঁর হাতে রয়েছে পাঁচটি পুষ্পশরপাশ, অঙ্কুশ ও ধনুকের প্রতীক একখণ্ড আখ। প্রতিটি আয়ুধই বিশেষ অর্থবহ। আসক্তির প্রতিরূপ পাশ। অঙ্কুশের অর্থ বিকর্ষণ বা বাসনামুক্তি। ইক্ষুদণ্ড হলো মন এবং পঞ্চশর যেন পাঁচটি ইন্দ্রিয়। তাঁর পূজায় সংযত হয় দেহ, মন ও আবেগ। কল্যাণ হয় নিজের পরিবারের, দেশ ও বিশ্বের। তাই তো আপন মুক্তি এবং জগৎ কল্যাণে এদিন তাঁর এই পূজা। তাইতো বেলুড় মঠে আজও এইদিনে দেবী ষোড়শীরই পূজা হয়।

কেরল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতের নানা জায়গায় দেবী ষোড়শী পূজিত হন শ্রীবিদ্যা হিসেবে। অতীতে তাঁর পূজা করেছেন শঙ্করাচার্য, অভিনবগুপ্ত, অপ্পয়দীক্ষিতের মতো মহাসাধকরাও। সেই ধারারই পথিক শ্রীরামকৃষ্ণ।

ফলহারিণী কালীপূজার দিন, রামকৃষ্ণের এই যে বিশেষ ষোড়শী পূজা; তা কিন্তু অন্য একটি কারণও বিশেষ তাৎপর্যবহ। এ শুধু নিজের মুক্তির জন্য নয়। এ পূজা অন্য অর্থে এক বিপ্লব। নারী শক্তির জাগরণ, নারীর স্বাধীনতার পথেও এ এক কালজয়ী পদক্ষেপ।

রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী স্ত্রী স্বাধীনতা, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা নারী শিক্ষা বিস্তারে আন্দোলন শুরু করেছিলেন প্রকাশ্যে এবং সকলকে জানিয়েই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এই সাধনার মধ্য দিয়ে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটালেন। নারীকে দেবীর মর্যাদা দিলেন। সব বন্ধন খুলে দিলেন। তাঁর এই বিপ্লবেরই উত্তর সাধক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ দেশে নারী শক্তি জাগরণ ও শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চালিয়ে গেছেন তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা।

ফলহারিণী কালীপূজার দিনটিকেই শ্রীরামকৃষ্ণের এভাবে সাধনার দিন হিসেবে বেছে নেওয়ারও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বঙ্গদেশে দেবী কালিকার পূজ হয় নানা রূপে। কখনও তিনি রক্ষাকালী আবার কখনও ফলহারিণী বা রটন্তীকালী হিসেবে পূজিত হন। কালী ব্রহ্মময়ী— সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের দেবী। আবার সব শক্তি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ও কর্মেরও তিনিই অধিষ্ঠাত্রী।

জ্যৈষ্ঠ মাসের অমবস্যার রাতে হয় ফলহারিণী কালীর পূজা। শাস্ত্রে বলা হয়, ফলহারিণী কালী একই সঙ্গে হরণ করেন সাধকের সব কর্মফল, দেন অভীষ্ঠফল— মোক্ষ-মুক্তি। সম্ভবত সে কারণেই নারীর বন্ধনমুক্তির ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার দিন হিসেবে বিশেষভাবে এই দিনটিকেই বেছেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সব পূজাতেই নিবেদন করা হয় নানা ফলফুলের নৈবেদ্য। জ্যৈষ্ঠে ফলহারিণী কালী পূজাতেও দেওয়া হয় আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি মরশুমি ফলের নৈবেদ্য। বিশেষ ভাবে দেওয়া হয় আখ। দেবতার সঙ্গে দেবীরও সাধক হিন্দুরা। নানা দেবীর মধ্যে হিন্দুদের সবচেয়ে প্রিয় লক্ষ্মী ও কালী। বছরের প্রায় প্রতি মাসেই হয় এঁদের বিশেষ পূজা। এই দুই দেবীর মধ্যে কার্তিকের দীপাবলি শ্যামাপূজা, মাঘমাসের রটন্তী কালী এবং জ্যৈষ্ঠের ফলহারিণী কালী পূজা পড়ে প্রায় অবশ্যের তালিকায়।

বঙ্গদেশে বহুকাল থেকেই গ্রীষ্মকালে রোগ-মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হয় বারোয়ারি রক্ষাকালীর পূজা। ফলহারিণী কালীর আরাধনাও এই বিশেষ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাতেই করে আসছে ঘরে অথবা মন্দিরে-মণ্ডপে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই ষোড়শী পূজার কারণেই ফলহারিণী কালীপূজা বাঙ্গলার ধর্মীয় ইতিহাসে স্থান পেয়েছে নারী মুক্তির অনুষ্ঠান এবং এক মহাজীবনের উত্তরণের অমৃতবেলা হিসেবে।

***(ফলহারিণী কালীপূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)***

# জন্মশতবর্ষে মানববন্ধনের তামিল কথাভাষ্যকার

**কৌশিক রায়**

দক্ষিণ ভারতের তামিল সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠলেই আমরা দেশপ্রেমিক মহাকবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকি। তবে, আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে তামিলনাড়ুতে জন্মানো আর এক প্রতিভাধর সাহিত্যিকের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। মানুষের সম্পর্কের সঙ্গে সমাজের চালচিত্রের টানাপোড়েনকে নিয়ে বেশ কয়েকটি মনোগ্রাহী, বিশ্লেষণাত্মক ও সংবেদনশীল উপন্যাস রচনা করেছিলেন তামিল বুদ্ধিজীবী মহলে 'থি জা' নামে সম্ভাষিত, থি জানকীরমণ।

অনেক সাহিত্যিকের মতোই লিটল ম্যাগাজিনকে অবলম্বন করেই সাহিত্যচর্যার উন্মেষ ঘটান থি জানকীরমণ। মানিক্কোদি নামের একটি অনুপত্রিকাতে লেখালেখির মাধ্যমে সাহিত্যের দরবারে অভিষেক ঘটে তাঁর। এরপর প্রকাশ হয় দুটি উপন্যাস— 'মোহম্মুল' (ইচ্ছাকণ্টক) ও 'আম্মা ভান্ধাল (মাকে স্মরণ করে)। থি জানকীরমণের লেখার মাধ্যমে মানিক্কোদি লিটল ম্যাগাজিনটি বাংলা সমসাময়িক কথাসাহিত্যে 'এক্ষণ', 'জিজ্ঞাসা' ও 'কৃত্তিবাস'-এর মতোই তামিল সাহিত্যে এক নবদিগন্তের সূচনা করে। তিনি ১৫০টি ছোটোগল্প, ৯টি উপন্যাস, সাতটি অণু উপন্যাস এবং ৪টি ভ্রমণকাহিনি লেখেন। বাস্তববাদ, সক্রিয় মানসিকতা এবং সমাজের ত্রুটি-দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর শ্লেষ, তাঁর লেখাগুলিকে আন্তন চেখভ, ও'হেনরি এবং গী দ্য মপাসঁর ছোটোগল্পের নিজস্ব ঘরানার সমপর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। অনুবাদক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে কুলদারঞ্জন রায়, সুধীন্দ্রনাথ রাহা আর দক্ষিণারঞ্জন বসুর মতোই সুকৃতী ছিলেন জানকীরমণ। তামিল ভাষাতে তিনি অনুবাদ করেন সুইডিশ লেখক— পার লেগারভিস্ট ও ইতালীয় লেখক গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার লেখা। মৃত্যুর তিন বছর আগে ১৯৭৯ সালে জানকীরামণ তাঁর ছোটোগল্প সংগ্রহ— 'শক্তি বাইথিয়াম'-এর জন্য সাহিত্য অ্যাকাদেমি পুরস্কার পান। লেখার প্রতি ভালোবাসার জন্যই লেখনী ধরেছিলেন থি জানকীরমণ। তিনি 'এথারক্কগ এজুথুগিরেন' (কেন আমি লিখি) নামে প্রবন্ধে লিখেছেন— 'লেখা আমাকে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি দেয়। এই পরিতৃপ্তির মধ্যে মিশে থাকে সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিচিতি। তবুও, কলম ধরাটা আমার কাছে সুখ-ই বলা যেতে পারে। আমার চারপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতিকে নিয়ে, চেনা-অচেনা মানুষজনকে নিয়েই আমি লিখি। অজানা কোনও জিনিসকে নিয়ে লিখতে চাই না আমি।'

থি জানকীরামণের লেখার অনেকটা স্থান জুড়েই আছে তাঁর জন্মস্থল তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর (তাঞ্জোর) শহরটি।

থি জানকীরমণের উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলিতে টমাস হার্ডির বাথশেবা এভারডেন, কাউন্ট, লিও তলস্তয়ের আন্না কারেনিনা আর মাসলোভা, জেন অস্টেন-এর অ্যাগনেস ওয়েকফিল্ড আর বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা, রাধারানী ও শান্তির মতোই নারী চরিত্রের সার্থক প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর সৃষ্ট যমুনা, অলঙ্করম, আম্মানি, কুঞ্জাম্মাল আর ভুবানার মতো সংবেদনশীলা, সহমর্মী নারী চরিত্রগুলি। চরিত্রগুলির স্বাধীনচিত্ততা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা যেন নারীবাদকে আর একবার প্রকাশ করেছে ভারতীয় কথাসাহিত্যের আঙিনাতে। নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রেমময়তা ঠিক শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের মতোই থি জানকীরমণের লেখাগুলিতে একটা সহজাত, প্রাণোচ্ছল রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁর চরিত্রগুলির যেন প্রতিটিই জীবনের সতেজ আবেগে পরিপূর্ণ। থি জানকীরমণের জীবনীকার— অধ্যাপক আর. কল্যাণরামণ তাই এই সাহিত্য শিল্পীর উপন্যাস এবং ছোটোগল্পগুলিকে ভারতীয় দক্ষিণী সাহিত্যের বিশেষ মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর 'সেম্পারথি' (সিঁদুরে জবা বা 'দ্য ক্রিমসন হিবিস্কাস' নামে ইংরেজিতে অনূদিত) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র— সত্তনাথন পিল্লাইয়ের চোখ দিয়ে পাঠক দেখতে পাবে স্বাধীনতার আগে এবং পরের সময়ে ভারতের সমাজজীবনের চালচিত্রকে। 'মারপ্পাসু' উপন্যাসে থি জানকীরমণ দেখিয়েছেন কর্মরতা নারীর স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অর্গল ভেঙে ফেলবার এক ইতিবাচক প্রয়াস। থি জানকীরামণের কন্যা উমা শঙ্করী, থি-র বেশ কয়েকটি গল্প, 'Ecstasy And Other Stories' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। চিরপ্রবহমান সমাজের দুর্নীতি, অশিক্ষা, নারীবিরোধ, অন্ধবিশ্বাস, ব্যাভিচার, বহুগামিতা, ধর্মান্ধতার মতো দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে উদ্দীপিত করে থি জানকীরমণের লেখাগুলি। □

# ব্রজেন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার মূলে ছিল বিজ্ঞানমনস্কতা

**দীপক খাঁ**

কলকাতা শহরে জন্ম ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের। স্কুলের পড়া শেষ করে সতেরো বছর বয়সে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। ১৮৮১ সাল তখন, তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) ছাত্র, এখানেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ। বয়সে নরেন্দ্রনাথের থেকে একবছর বড়ো। তাঁর থেকে এক ক্লাস নীচুতে পড়েন। দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। দু'জনেই ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, নিয়মিত উপাসনায় যোগ দেন। এম.এ ক্লাসে ভর্তি হন ১৮৮৪ সালে, বিষয় দর্শন শাস্ত্র। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম। শিক্ষকতা শুরু করলেন— সিটি কলেজে ইংরেজি পড়ানোর কাজ। ১৮৮৪ সালে ইন্দুমতী নামের এক বিদুষী মহিলাকে বিবাহ করেন। পরে তিনি চলে আসেন নাগপুরে। মরিস কলেজে অধ্যাপনার কাজ করে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। ১৮৮৭ সালেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। সেই সময় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যক্ষ লিভিংস্টোন স্থানান্তরিত হয়েছেন। অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ বহরমপুরের ওই কলেজে নিযুক্ত হলেন। একটানা ৯ বছর ওই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে ১৮৯৬ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষের পদে খ্যাতি ও সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জয়গোপাল মুখার্জি, পণ্ডিত কোকিলশ্বর শাস্ত্রী, শিশির কুমার বর্মণ তাঁর সময়কালে ওই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৯৯ সালে রোমে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে তাঁকে পাঠানো হয়। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে তিনি শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বকথা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন যা শুনে বিদ্বজ্জনেরা বিস্মিত হন। সমগ্র ইউরোপে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত

ইউনিভারসাল রেসেস কংগ্রেসের সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি রূপে যান। এই সম্মেলনে তাঁকে প্রথম বক্তা নির্বাচিত করা হয়। তিনি সমাজ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে উপস্থিত শ্রোতারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে দর্শন শাস্ত্রে বিভাগীয় প্রধানের পদে আসীন হন। তাঁর অধ্যাপনার ধরন ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ছাত্রেরা এই বিষয়টির প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগী হয়ে পড়ে। ক্রমে স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান বিষয়ে চর্চা করলেন। দীর্ঘ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল হিসেবে রচিত হলো এক নিবন্ধ— 'The Positive Science of the Ancient Hindus.' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রিসার্চ পেপারটি জমা দিলেন। এই প্রবন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং বিশ্লেষণ শক্তির অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে। ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এসসি উপাধিতে সম্মানিত করে। মহীশূরের তদানীন্তন মহারাজ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণের জন্য স্যার স্যাডলারকে অনুরোধ করেন। স্যার স্যাডলার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুরোধ খারিজ করে ওই পদে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম প্রস্তাব করেন।

১৯২১ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এলেন মহীশূরে। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা দশ বছর কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। এক্ষেত্রে আচার্য শীলের অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর জ্ঞান ও প্রশাসনিক বিচার বুদ্ধি প্রভাব ফেলেছিল। বহু সংসদ গঠিত হলো। ব্রজেন্দ্রনাথ হলেন তাঁর সভাপতি। ১৯২৬ সালে তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হলো। মহীশূর রাজার পক্ষ থেকে 'রাজরত্ন প্রদীপ' উপাধি দেওয়া হয়।

১৯৩৩ সালে রাজারামমোহন রায়ের মৃত্যুশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি একটি অসাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আজীবনের বন্ধু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রশস্তি রচনা করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেটি পাঠ করে শোনানো হয়। ১৯৩৭ সালে কলকাতার টাউন হলে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্ম সম্মেলনে তিনি পৌরোহিত্য করেন।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল জীবনে তিন-চারটি বই, ভাষণ ও প্রবন্ধ লিখে গেছেন, যা তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও অপরিসীম জ্ঞানের নির্দশন বহন করেছে। উদাহরণ হিসেবে 'Positive Science of the Ancient Hindus' বইটির উল্লেখ করা যায়। প্রাচীন ভারত থেকে জ্ঞানের আলো দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাঁরই লুপ্ত গৌরব ও কীর্তিকাহিনি উদ্ধার করে পুস্তকাকারে আমাদের উপহার দিয়েছেন।

**সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে হলো জনগণের মনোভাব জানা এবং তা প্রকাশ করা। জনগণের আবেগকে জাগ্রত করাও সংবাদপত্রের প্রধান উদ্দেশ্যে।**
**— গান্ধীজী**

# সেদিনের সংবাদপত্র পথ দেখাতে পারে আজকের মিডিয়াকে

**সাধন কুমার পাল**

ভারতের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব সারা দেশে উৎসাহের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। বছরব্যাপী চলা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাস এবং এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে তা থেকে অনুপ্রেরণা দিয়ে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের পূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক নেতাই সাংবাদিকে পরিণত হয়েছিলেন জনগণের কাছে তাদের ভাবনা তুলে ধরতে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সংবাদপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। সে সময় প্রকাশিত সংবাদপত্র ব্রিটিশ শাসকদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। সে সময় সাংবাদিকতাকে কেউ পেশা হিসেবে দেখতেন না। সে সময় সংবাদপত্র প্রকাশ, সাংবাদিকতা ছিল একটি মিশন। আদি সংবাদিক দেবর্ষি নারদের কাছে সংবাদ আদান-প্রদানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ভারতের সংবাদজগৎ আক্ষরিক অর্থেই সেই নারদীয় ধারা অনুসরণ করে এসেছে। যেমন, ভারতীয় পরম্পরাকে সামনে রেখে ১৮২৬ সালের ৩০ মে নারদ জয়ন্তীর দিন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সাংবাদিক দেবর্ষি নারদকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে কলকাতায় ভারতের প্রথম হিন্দি সাপ্তাহিক 'উদন্ত মার্তণ্ড' আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতের সংবাদজগৎ লোভনীয় পেশা হিসেবে স্বীকৃত। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিক প্রাপ্তির আশায় আর দশটা পেশার মতো এই পেশাও 'নীতিহীনতা' নামক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ের নারদীয় সংস্কৃতির সংবাদজগতের ইতিহাস সামনে এনে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ জগতের চেতনা পুনর্জাগরণের ক্ষুদ্র প্রয়াসই এই লেখার মূল লক্ষ্য।

১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'সংবাদ কৌমুদী'। সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক তারাচাঁদ দত্ত। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় এই পত্রিকা ছাপা হতো। রামমোহন যদিও পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন না, কিন্তু তারই নির্দেশিত নীতিতে পত্রিকাটি পরিচালিত হতো। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার-বিরুদ্ধ মতের তথা প্রগতিবাদী মনোভাবের পৃষ্ঠপোষক রামমোহনের লেখা সংবাদ কৌমুদীর অন্যতম বিষয় হয়ে উঠল। এই সাপ্তাহিক প্রথমে মঙ্গলবার ও পরে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হতো। এতে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সম্পর্কিত নানা আলোচনা ও সংবাদ, দেশের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সংবাদ, জ্ঞাতব্য তথ্য ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত পত্রাবলী ছাপা হতো। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বেঙ্গল গেজেটের পর, সংবাদ-কৌমুদী-ই বাংলা ভাষায় প্রথম বাঙ্গালি সম্পাদিত সাময়িকপত্র। জনসাধারণের অভাব, অভিযোগের প্রতি শাসকদের ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। সংবাদপত্রকে সঠিকভাবে গণমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সংবাদ-কৌমুদী-র ভূমিকা অনেকখানি সার্থক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় রামমোহন প্রবর্তিত কাগজেই আমরা জাতীয়তাবোধের প্রথম স্ফুরণ দেখতে পাই। দূরদর্শী রামমোহন দেশের অর্থনৈতিক পরাধীনতা নিয়েও চিন্তাভাবনা করেছেন, যার প্রতিফলন তাঁর পত্রিকায়ও দেখতে পাওয়া যায়। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে পত্রিকার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে সজাগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে শুধু শাসনকর্তাদের নয়, রামমোহন দেশবাসীকেও দায়িত্বশীল হতে পত্রিকায় নির্দেশ দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সামাজিক- রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ পরাধীন একটি জাতির মুখপত্ররূপে সংবাদ কৌমুদী ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায়, সামাজিক উন্নয়নে, স্বাদেশিকতা প্রচারে যেভাবে সোচ্চার হয়েছে ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে তার অবদান অবিস্মরণীয়। সমাজ সংস্কারে সংবাদ কৌমুদীর ভূমিকা সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিদের অসন্তোষের কারণ হয়েছিল।

ফঃ ৫

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের সামাজিক সংস্কার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই 'সংবাদ কৌমুদী'-র ১৩টি সংখ্যার পর তিনি পত্রিকার দায়িত্ব ছেড়ে দিলে রামমোহন তার দায়িত্ব নেন (১৮২২ সাল)। এর শেষ পর্যায়ে সম্পাদক ছিলেন রামমোহন পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়। সংবাদ কৌমুদী-কে কেন্দ্র করেই রামমোহনের প্রত্যক্ষ এবং সচেতনভাবে সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ। তার পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায় দায়িত্ব বাঙ্গলার সংবাদপত্রের বিকাশে এক নতুন মাত্রা এনে দিল। উল্লেখ্য, ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত সংবাদ কৌমুদী প্রকাশিত হতো।

রামমোহনের সময় এ দেশে শিক্ষিত মহলে ফার্সি ভাষাতেই বিদ্যাচর্চা করা হতো। রামমোহন এসব শিক্ষিতদের জন্য ফার্সি ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করার সংকল্প করেন। ১৮২২ সালের ১২ এপ্রিল 'মিরাৎ-উল্-আখবার' (সংবাদের দর্পণ) নামে রামমোহন রায় সম্পাদিত ফার্সি ভাষায় এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রতি শুক্রবার পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। পরিকল্পনা হয়েছিল এই পত্রিকা দেশবাসীকে তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করবে। এই পত্রিকা শাসক শ্রেণীকে তাদের প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা কী তা জানতে সাহায্য করবে এবং প্রজারাও সরকারি আইন ও নিয়মবিধির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকবে। এর ফলে শাসকশ্রেণী সহজেই জনগণের অভাব-অভিযোগ এবং তাদের অসন্তোষের প্রতিকার করতে পারবে। অন্যদিকে শাসকপক্ষ কীভাবে জনগণের নিরপত্তারক্ষা তথা তাদের কষ্টলাঘব করতে পারে সে বিষয়েও জনসাধারণ স্যমকভাবে ধারণা লাভ করবে। সুতরাং বলা যায় রামমোহনই প্রথম তৎকালীন একমাত্র গণমাধ্যম সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রামমোহন তার সময়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার যে প্রচেষ্টা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। রামমোহন যখন তাঁর সংগ্রাম শুরু করেন আমাদের দেশের লোক রাজনীতি সম্পকে অজ্ঞ ও নিস্পৃহ। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি উদীয়মান রাজশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার পক্ষে সাহসী নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের দাবি তখন সাধারণের কাছে অলীক কল্পনা। আবেদনের ভঙ্গিতে ক্ষমতাশীল ব্রিটিশ সরকারের কাজের সমালোচনা করা ধৃষ্টতা।

'মিরাৎ-উল্-আখবার'-এর অনেকে লেখাই সরকার আপত্তিকর মনে করেছিল। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের অ্যাডামের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণকারী মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের কবলে 'মিরাৎ-উল্-আখবার'ও পড়ল। কিন্তু রামমোহন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও দেশবাসীর ন্যায্য অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে এগিয়ে এলেন। জন অ্যাডামের অধ্যাদেশ প্রবর্তনের প্রক্রিয়া যখন চলছিল, তখনই ১৮২৩ সালের ১৭ মার্চ রামমোহন রায় সুপ্রিম কোর্টে এই প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে একটি আবেদন পেশ করেন। এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ। বঙ্গদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই আবেদনপত্রটি একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর আগে ভারতবর্ষে অন্য কেউ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে এমন জোরালো এবং যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদলিপি পেশ করেননি। কিন্তু যতই যুক্তিপূর্ণ হোক, এ আবেদনপত্রটি সুপ্রিম কোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। রামমোহন এবং তাঁর বন্ধুরা তখনো পরাজয় স্বীকার করে নেননি, বরং লন্ডনে রাজার কাছে আবেদন জানান, যদিও সে আবেদনে কোনো কাজ হয়নি। অ্যাডামসের এই 'কালাকানুন'-এর প্রতিবাদে তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এর প্রতিবাদ করতে গিয়েই লেখেন— 'হৃদয়ের শত শত ফোঁটা শোণিতের বিনিময়ে অর্জন করেছো যে অমূল্য সম্মান, প্রিয় মোর, তুচ্ছ দারোয়ানের অনুগ্রহ পাবার আশায় তাকে করো না বিক্রয়'। তিনি 'মিরাৎ-উল্- আখবার' বন্ধ করে দেন। পত্রিকা বন্ধ হলেও দিনের আলোয় প্রকাশিত হলো সেই উপলব্ধি যে, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা কোনো কারণেই বিক্রি করা যায় না। ব্রিটিশ রাজত্বে মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশে ন্যায্য অধিকার রক্ষায় আমাদের দেশের সংবাদপত্রসেবীরা যে অনলস প্রয়াস চালিয়েছিলেন রামমোহনের আবেদনের মধ্য দিয়েই তার ভিত্তিপ্রস্তরটি স্থাপিত হয়। সর্বোপরি, যে উপলব্ধি আজ থেকে ১৭৭ বছর আগে ঘটেছিল, তা যে ভারতীয় স্বাধীনচেতা সাংবাদিকতার এক অনন্য উদাহরণ, তা মেনে নিতে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়।

'উদন্ত্ মার্তণ্ড্' হলো ৩০ মে, ১৮২৬ সালে কলকাতা থেকে যুগল কিশোর শুক্লা দ্বারা প্রকাশিত প্রথম হিন্দি সংবাদপত্র। এটি একটি সাপ্তাহিক ছিল, যা প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হতো। বার্ষিক মূল্য ছিল দুই টাকা। এটি এক বছর সাত মাস ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দিভাষী কলকাতাবাসীরা প্রত্যাশিতভাবে পত্রিকাটির প্রতি কোনো আগ্রহ দেখায়নি, যার কারণে ৪ ডিসেম্বর ১৮২৭-এ নিম্নলিখিত সম্পাদকীয়টির সঙ্গে এটির অসময়ে বন্ধ হয়ে যায়— 'দিনটি উদন্ত মার্তণ্ডের মৃত্যুকে চিহ্নিত করে, এখানে এটিও শেষ পর্যন্ত সূর্যাস্তের দিকে যায়'। উদন্ত্ একটি রাজনৈতিক সংবাদপত্র ছিল না, কিন্তু হিন্দি ভাষার অবদানের জন্য এটিকে কখনই অবজ্ঞা করা যায় না।

১৮৬৩ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে প্রকাশিত হতো 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। পত্রিকাটি ১৮৬৩ সাল (বৈশাখ ১২৭০) থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ২২ বছর প্রকাশিত হয়। গ্রামবার্ত্তা পত্রিকায় হরিনাথ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান-সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশের পাশাপাশি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে জমিদার ও ব্রিটিশ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি প্রকাশ করেন। একটা পর্যায়ে জমিদাররা তাঁর ওপর হামলার পরিকল্পনা করেন। তখন লালন সাঁই অনুসারীদের নিয়ে হরিনাথের বাড়িতে এসে পাহারা দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেন।

'গ্রামবার্ত্তা' শুরুতে মাসিক হলেও পরে পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এবং পুনরায় মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। বলা হয়, 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র কারণে সে সময় সৃষ্টি হয়েছে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রায় বাহাদুর জলধর সেন, দীনেন্দ্র কুমার রায়, মীর মশারফ হোসেনের মতো লেখক। নিজের সমস্ত ধনসম্পদ ও সামর্থ্য উজাড় করে দিয়েছিলেন

এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য। পত্রিকার কাজে পূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য তিনি শিক্ষকতার চাকুরিটিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। গণসংগীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে, শিলাইদহে জমিদারির দায়িত্বে আসা ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের প্রজা নিপীড়নের কথা কাঙাল হরিনাথ তাঁর এই পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এবং নীলকর ও জমিদারদের প্রজাপীড়নের কথা খুব গুরুত্বসহকারে প্রকাশ পেত গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়। এমনকী এই জন্য জমিদাররা তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল লাঠিয়াল নিয়ে। নিজের প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও লোকশিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন তিনি। হরিনাথ গ্রামবার্তা প্রকাশিকা প্রকাশের জন্য সমস্ত কিছু এতটাই উজাড় করে দিয়েছিলেন যে প্রকৃত অর্থেই তিনি কাঙালে পরিণত হন। যদিও জানা যায় রাজশাহীর রানি স্বর্ণকুমারী দেবী এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য অর্থসাহায্য করেছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের জন্য কপর্দক শূন্য হয়েও বাঙ্গলার বিদ্যুৎসমাজে যথাযোগ্য মর্যাদা পাননি। তিনি ১৮৯৬ সালের ১৬ এপ্রিল মারা যান। তার জন্ম কুমারখালির কুণ্ডুপাড়ায় ১৮৩৩ সালের ২২ জুলাই।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় পত্রিকাগুলি সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এই সমালোচনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯০৮, ১৯১০ ও ১৯১১ সালে অন্তত তিনটি আইন পাশ করে। ১৯০৮ সালে পাশ হয় প্ররোচনা আইন, ১৯১০ সালে ভারতীয় প্রেস আইন এবং তার পরের বছর রাজদ্রোহিতা আইন। এসব আইনের আওতায় বাংলা-সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার তিন শোর বেশি পত্রপত্রিকা এবং প্রায় সাড়ে তিন শো ছাপাখানার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। তবে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠা সত্ত্বেও ১৯২২ সালে ১৯০৮ এবং ১৯১০ সালের আইন দুটি সরকার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ সময় থেকে আরম্ভ করে অসহযোগ আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। দমনপীড়নের অঙ্গ হিসেবে নতুন নতুন আইনও প্রণীত হয়। যেমন, ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরি) আইন গৃহীত হয়।

সে সময় ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকার মতো এ দেশে সংবাদপত্র অত জোরালো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার পাঠকসংখ্যাও ছিল সমান্যই। ওদিকে, শিক্ষার হার এবং নগরায়ণ খুব নগণ্য থাকায় দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকার প্রচার সংখ্যাও বেশি ছিল না। ফলে পত্রিকাগুলি কোনো জনপ্রিয় ভিত্তি অথবা জনসমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যে ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্পায়ন এবং মধ্যবিত্তের প্রভাব সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য জরুরি, ভারতবর্ষে সেই পরিবেশ উনিশ শতকে কখনই তৈরি হয়নি। এমনকী, দ্রুত মুদ্রণক্ষম ছাপাখানাও ছিল না। তা সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে বেশ কয়েকজন ভারতীয় এবং ভারতে বসবাসরত ইংরেজও নানাভাবে আন্দোলন করেন।

দেশীয়দের মধ্যে প্রথমদিকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন রামমোহন রায়। তিনি একাধিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হিকির মতো ব্যবসা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজ সংস্কার এবং জনমত গঠনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিবেকবান সম্পাদক হিসেবে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে, একথা মনে রেখেই তিনি তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর দায়িত্বের কথা মনে রেখে তিনি বহু সামাজিক রীতিনীতির সমালোচনা করেন। তাছাড়া, ধর্মের ব্যাপারে যেসব রীতিনীতিকে তাঁর কাছে অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে, তিনি সেসবের তীব্র সমালোচনা করেন।

এই দেশের মহান ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে এমন কিছু বরণীয় ও স্মরণীয় ব্যক্তির নাম যাঁদের জীবন শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতার হাত ধরে। মহাত্মা গান্ধী সেরকমই এক ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজীর লেখায় আদতে ইংরেজদের মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের চোরা স্রোত নেমে যেত। ইংরেজ সরকার যে কোনো মূল্যে তার বলিষ্ঠ কলমের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। গান্ধীজীর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৯০৩-০৪ সালে তিনি যোগ দেন 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামক পত্রিকায়। এটি ছিল একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তাঁর চিন্তাভাবনা, মানুষের দুঃখদুর্দশা, জনগণের আবেগ, প্রতিবাদ প্রকাশ করতেন। গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন সাংবাদিকতার জন্য, একথা বলাই যায়। 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' ইংরেজি ছাড়াও তামিল, গুজরাটি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ হয়েছে। এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের টনক নড়ে এবং তার ফলে বেশ কিছু আইনেরও রদবদল করতে বাধ্য হয় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার।

১৯১৪ সাল। গান্ধীজী এলেন ভারতে। যোগ দিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তিনি মনে করতেন জনগণের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দেওয়াই একজন দেশপ্রেমিক সাংবাদিকের কাজ। বিখ্যাত সাংবাদিক কে রামরাও গান্ধীজী সম্পর্কে বলেছিলেন, গান্ধীজী সংবাদপত্র জগতের জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতেন। সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি তাঁর বক্তব্য, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যবহার করতেন সংবাদপত্রকে। ভারতীয় সাংবাদিকতায় তাঁর অসামান্য ভূমিকা এখান থেকেই উপলব্ধি করা যায়। ১৯১৯ সাল নাগাদ গান্ধীজী 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক হন। এই সময়ে তিনি 'নবজীবন' নামক একটি গুজরাটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাটি ১৯৩২ সাল অবধি চলেছিল। এই পত্রিকাটি মূলত গান্ধীজীর ঐকান্তিক চেষ্টায় সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। তিনি তাঁর আত্মকথায় বলেছিলেন সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে হলো জনগণের মনোভাব জানা এবং তা প্রকাশ করা। তিনি আরও বলেছিলেন জনগণের আবেগকে জাগ্রত করাও সংবাদপত্রের প্রধান

উদ্দেশ্যে। গান্ধীজী মনে করতেন সত্যি ঘটনাগুলিকে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করা উচিত একটি সংবাদপত্রের। 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকা দক্ষতার সঙ্গে অনেকগুলি বছর সম্পাদনা করেছিলেন, শুধুমাত্র ইংরেজ সরকারের দৌলতে তাঁর জেলে থাকার সময়টুকু বাদ দিলে। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার পর গান্ধীজী শুরু করেন 'হরিজন' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা। হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর সংগ্রাম চিরস্মরণীয়। এর জন্য হরিজন পত্রিকাটি ছাড়াও গুজরাটি ভাষায় 'হরিজন বন্ধু' এবং হিন্দি ভাষায় 'হরিজন সেবক' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি নিজে হরিজন পত্রিকার সম্পাদক না হয়েও এই পত্রিকার উন্নতির জন্য প্রভূত চেষ্টা করেছেন এবং পত্রিকাটিকে আন্দোলনের একটি অস্ত্র পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজন, গুরুত্ব ও বিস্তারের জন্য, দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য দক্ষতার সঙ্গে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনা ছিল। সম্পাদক হিসেবে তিনি অন্যরকম ভাবধারায় চলতেন। সর্বাগ্রে তিনি বিজ্ঞাপন বিরোধী ছিলেন। তাঁর পত্রিকায় কোনও বিজ্ঞাপন ছাপা হতো না। কিন্তু তিনি এটাও চাইতেন না যে পত্রিকা লোকসানে চলুক। সেই কারণে প্রচার বাড়াতে সচেষ্ট ছিলেন। সংবাদপত্র চালাতে যে অর্থের প্রয়োজন তা তিনি সংগ্রহ করতেন গ্রাহকদের কাছ থেকে। পত্রিকা চালানোর পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকতো তা তিনি পুনরায় গ্রাহকদের ফেরত দিয়ে দিতেন নতুবা অন্য কোনও ভালো কাজে ব্যবহার করতেন। তিনি নিজে সংবাদপত্র থেকে কোনও অর্থ নিজের জন্য নিতেন না। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবক রূপে নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। সরকারের চাপিয়ে দেওয়া কোনও নির্দেশ তা ছিল না-পসন্দ। তিনি এটি মানতে চাইতেন না। তবে সংবাদপত্র পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সরাসরি কোনও সংঘর্ষ করেননি। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর নিজস্ব অহিংসনীতি মেনে চলতেন। গান্ধীজী ইংরেজি সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা মন থেকে পছন্দ করতেন না। তবুও তিনি এটা করতেন অহিন্দিভাষীদের বিশেষত দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর মতবাদ পৌঁছে দেবার জন্য। তিনি মনে করতেন আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদপত্র অনেক বেশি করে প্রকাশিত হওয়া উচিত। কারণ এটি অনেক বেশি সাধারণ মানুষের কাছে খবর পৌঁছে দেয়।

তথ্য বলছে, ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রচার সংখ্যা ছিল মাত্র ১২০০, কিন্তু নবজীবন পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল ১২০০০। আর এই কারণে তিনি পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা কম করে ২৫০০ না হলে সেই পত্রিকার সম্পাদনা করতে চাইতেন না। পরে দেখা গেল ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে হলো ৪৫০০০। গান্ধীজীর সাংবাদিকতার শৈলী ছিল সোজাসাপটা, সহজসরল ও বলিষ্ঠ। তিনি বলতেন পত্রিকা একপাতার হোক, তবুও তাতে যেন সুন্দর ভাষায় লেখা থাকে। গান্ধীজী গুজরাটি ভাষার সাংবাদিকতায় এক নতুন জোয়ার নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সময় থেকেই গুজরাটি ভাষার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা উন্নত হতে শুরু করে এবং অন্য আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রের সঙ্গে তাল মেলাতে শুরু করে শুধুমাত্র তাঁর লিখনশৈলীর জন্য। তাঁর চিন্তাভাবনা, স্বাধীনতা সংগ্রামের বক্তব্য, জনগণের মধ্যে দুর্বল শ্রেণীর কথা, তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকও দুরবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হতো তাঁর লেখায়।

ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই প্রথম আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব বুঝে তার উন্নতি কীভাবে করা যায় তা নিজে কর্মের মধ্য দিয়ে সকলকে দেখিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে ব্রিটিশ রাজকে উৎখাত করতে কলমের থেকে আর কিছু বলিষ্ঠ মাধ্যম নেই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, আঞ্চলিক ভাষায় সাংবাদিকতার সূচনাও আক্ষরিক অর্থে যে তাঁর হাত ধরেই হয়েছিল সেই কথা বলাই যায়।

১৮৬৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা শুরু করেন দুই ভাই— শিশির কুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ। এই সংবাদপত্রের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। নব্য জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে 'ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রবর্তন করা হয় ১৮৭৮ সালে। এ আইন প্রবর্তন করেন ভাইসরয় লিটন এবং এটি প্রযোজ্য ছিল কেবল ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের পত্রিকার জন্যে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অমৃতবাজার পত্রিকাকে দমন করার জন্যেই এই আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল।

কিন্তু পত্রিকার অত্যন্ত বুদ্ধিমান সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ পরাজয় স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। তিনি রাতারাতি তাঁর পত্রিকাকে ইংরেজি ভাষার পত্রিকায় রূপান্তরিত করেন এবং এভাবে আইনের আসল উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করেন। অমৃতবাজার পত্রিকা রেহাই পেলেও ১৯০৬ সালে প্রকাশিত যুগান্তর আইনের রোষ থেকে রক্ষা পায়নি। প্রকাশের পরের বছর দুটি লেখার জন্যে লেখক এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং পত্রিকার প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। পরের বছর সন্ধ্যা পত্রিকাও সরকারি রোষে পড়ে। ১৮৭০ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত আরও অনেক শক্তিশালী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন বিপিন চন্দ্র পাল ১৯০৬ সালে বন্দেমাতরম্ পত্রিকা প্রকাশ করেন, ১৯০৮-এ ইংলন্ডে গিয়েও তিনি স্বরাজ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে পৃথক দল প্রতিষ্ঠার পরে সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা চালাতেন। জি. সুব্রহ্মনিয়াম আইয়ারের সম্পাদনায় হিন্দু ও স্বদেশমিত্রন, দাদাভাই নওরোজীর ভয়েস অব ইন্ডিয়া, বালগঙ্গাধর তিলক দুটি সংবাদপত্র চালাতেন, এদের মধ্যে মারাঠী কেশরী এবং ইংরেজি মহরাত্ত। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ, পণপ্রথা, বিধবার পুনর্বিবাহ ইত্যাদির মতো সামাজিক সংস্কারের জন্য প্রেস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ছিল। এটি নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা আনতে সাহায্য করেছিল। এটি মানুষকে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে অস্পৃশ্যতা একটি অপরাধ। এটি তাদের একত্রিত হতে এবং জনগণের কাছে তাদের মতামত প্রকাশ করতে সহায়তা করেছিল। অনুল্লেখিত এমন অনেক পত্রিকা ছিল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

# ঐতিহ্যের ইতিকথায় সংস্কার ভারতীর নৃত্যগীতি আলেখ্য 'নমামি ভারতবর্ষম্'

**তিলক সেনগুপ্ত**

একদা এদেশের পরম বৈভবশালী অতীত ঐতিহ্য, পরবর্তীকালে বিদেশি শত্রুর আক্রমণ ও পরাধীনতার গ্লানি, দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। দেশের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পর্বে নতুন ভারত, সমৃদ্ধিশালী ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়ে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা— নমামি ভারতবর্ষম্।

'সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ।' কবিগুরুর জন্মদিনের মাহেন্দ্রক্ষণে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আসর বসেছিল কলকাতার আইসিসিআর মঞ্চে। স্বাধীনতার ৭৫ অমৃত মাহোৎসব পর্বে তৃতীয় পর্যায়ের বিশেষ অনুষ্ঠানের সূচনা হলো— 'ও আমার দেশের মাটি...' রবীন্দ্র গানের মাধ্যমেই। সংস্কার ভারতী সংগীত গোষ্ঠীর শিল্পীদের সম্মিলিত কণ্ঠে রবীন্দ্র গানেই কবি প্রণাম নিবেদিত হলো। প্রারম্ভিক পর্বে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সুধীরচন্দ্র মৈত্র মহাশয়কে সম্মাননা জানানো হলো। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সন্তুরবাদক শিল্পী পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য, সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় অধিকারী নীলাঞ্জনা রায়, সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি শিক্ষাবিদ ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ পান্ত নিবেদিত নৃত্যগীতি আলেখ্যে— 'নমামি ভারতবর্ষম্' পরিবেশিত হলো। মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে স্মরণ করে ভারতমাতার পরম বৈভবশালী অতীত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি শত্রুর আক্রমণ ও পরাধীনতার গ্লানি ও যন্ত্রণার কথাও বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশমাতৃকার লক্ষ লক্ষ বীর সন্তানের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার বীরগাথাও উল্লিখিত হয়েছে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানে সজ্জিত ভারতমায়ের সংস্কৃতি ও রীতিনীতির এক সম্মিলিত রূপ এবং এদেশের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির মূলমন্ত্র হলো কোটি কোটি সন্তানের ঐক্যসূত্র, যা অবলম্বন করে আগামীদিনে নতুন ভারত, সমৃদ্ধিশালী ভারত গড়ার কর্মযজ্ঞে তরুণ প্রজন্মকে ব্রতী হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে 'নমামি ভারতবর্ষম্' নৃত্যগীতি আলেখ্যের মাধ্যমে।

দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পাঁচটি জেলার ৫৫ জন নৃত্যশিল্পী অংশগ্রহণ করেন। নৃত্যনাট্যের ভাষ্য, সংগীত রচনা, সুর সংযোজনে সংস্কার ভারতী শিল্পীরা দক্ষতার পরিচয় রাখেন। বাংলা গীত, ভাষ্য রচনা ও আবহ চিত্র প্রক্ষেপণে অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। সুরকার ও সংগীত সংযোজনে শিল্পী ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য। যন্ত্রানুষঙ্গে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। আলেখ্যতে মোট সাতটি গান ব্যবহার করা হয়েছে। একটি বাংলা এবং ছয়টি হিন্দি। হিন্দি গীত রচনা করেছেন— সমাজ কুমার বসু। সংগীতাংশে ছিলেন— ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার, বাসুদেব বসু, অরুণাভ পাত্র, রুমা মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা মল্লিক, রুমা মুখার্জি, দেবারতি চৌধুরী, অঙ্কিতা দাস, পারমিতা নিয়োগী, সুনীতা রায় কর্মকার, সুন্দরা ব্যানার্জি, মীরা দাস, সোনালী উখাসনী, কাকলি মুখার্জি, অনামিকা হালদার, সুজাতা ভট্টাচার্য ও রীতা ঘোষ। ভাষ্য পাঠ শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, লিপিকা চৌধুরী ও বৈশালী ভট্টাচার্য।

নৃত্যনির্মিতিতে তিনটি সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীদের উপস্থাপনা দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেছে। 'ভারত আমার স্বদেশ আমার...' এবং 'পহাড়োসে বুলন্দ আপনে...' গান দুটির সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে সিউড়ি শৃঞ্জন সংস্থার শিল্পীরা। নৃত্য পরিচালনায় মৌমিতা বিষ্ণু সেনগুপ্ত। নৃত্যাংশে রিম্পা হাজরা, সুস্মিতা গিরি, তিতলি গিরি, দেবস্মিতা দত্ত, মৌমিতা সাহা, পর্ণশ্রী দাস, নন্দিনী পাল, তানিয়া চ্যাটার্জি, পৌলমী সাধু, স্বস্তিকা ঘোষ ও মৌমিতা বিষ্ণু সেনগুপ্ত। এছাড়াও হিন্দি দুটি গান— 'মুনিঋষিয়োঁনে শুনাই...', 'চলিরে চলিরে চলি...' গানে নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যরিদম্ সংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা। পরিচালনায় মেহেন্দি চক্রবর্তী। নৃত্যাংশে— রেশমী সিং, দেবলীনা দাস, রাহুল দাস, রিয়া সরকার, স্বর্ণালী দাস, ঈশানী পাল, অন্বেষা রায়, আর্শিয়া চ্যাটার্জি ও রিপন জানা। অপর তিনটি গান— 'শুনকে ভারত মা কী এ পুকার...', 'সচ্ কী রাহপে হম চলতে রহেঙ্গে...' ও 'পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ...' গানে নৃত্য পরিবেশন করেন গৌড়ীয় চারুকলা ভারতী। পরিচালনায় : সৌম্য ভৌমিক। নৃত্যাংশে— শ্রীজিত মণ্ডল, দেবব্রী মণ্ডল, বিদিত্বা চ্যাটার্জি, রাজন্যা চৌধুরী, শ্রেয়সী মণ্ডল, মেঘা বাহাদুর, স্বীকৃতি মাজী, দীপিকা সিং, পারমিতা রায়, প্রীতিরাণী দাস, পূরবী পাত্র, সৃজনা প্রামাণিক, মৌবনি বসাক, কৌশিকা সাউ, সায়নী পরামানিক, দেবেজ্যোত মল্লিক, সুরজিৎ দাস, বাবিন পাল, শ্রীদীপ কর্মকার, রাকেশ মাজী, অনুষ্কা ওঝা, শ্রেয়া পট্টনায়ক, সোনিয়া সামন্ত, সমৃদ্ধি আদক, মেকনা বাগ, স্নেহা মান্না, সুস্মিতা পাল ও সায়ন্তী মণ্ডল। সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক ভরত কুণ্ডু বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে আমরা বছর ব্যাপী সাংস্কৃতিক নানা বিধার উপর কাজ করছি। সংস্কার ভারতীর নৃত্য ও সংগীত বিধার এই উপস্থাপনা দর্শকদের মনকে স্পর্শ করেছে— এটা আমাদের একটা পরম প্রাপ্তি। ▯

# এক মহামানবেবর কথা

বিয়েবাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছেন এক ভদ্রলোক। দেখে ভিখারিও মনে হয় না। বেশ সৌম্য, সুদর্শন চেহারা। তবু ভিক্ষা চাইছেন। কেউ ভিক্ষা দিচ্ছেন, কেউ পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন।

সালটা ১৯০৪ কিংবা ১৯০৫ হবে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ১৮৮০ সালে বিলেত গেলেন এক যুবক। সেখান থেকে এমআরসিপি হয়ে দেশে ফিরলেন। তারপর প্র্যাকটিস শুরু করলেন। গরিবের ভগবান তিনি। রোগীর ওযুধ কেনার পয়সা নেই। ফি তো নিলেনই না, ওযুধের টাকাও দিয়ে দিলেন।

দেখা দিল কলকাতার সেই ভয়ংকর প্লেগ মহামারী। প্রতিদিন প্রচুর মানুষ মারা যেতে লাগল। সব ভয় তুচ্ছ করে উত্তর কলকাতায় সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন সেই ডাক্তারবাবু। রোগীর পরিবারকে সচেতন করছেন। একাজে তাঁর সঙ্গী আর এক মহীয়সী নারী। তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা। সেবাকাজে নিবেদিতাও নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছেন। সেই বিলেত ফেরত ডাক্তারবাবু প্রখর রোদে পাড়ায় পাড়ায় রোগী দেখে বেড়াচ্ছেন। মানুষকে ভালোবাসার এত নেশা? কই আমরা তো পারি না! কী প্রয়োজন ছিল একজন বিলেত ফেরত ডাক্তারের এসব করার? ওই যে কথা আছে, কিছু মানুষ এই পৃথিবীতে আসেন, যাঁরা অন্য ধাতুতে গড়া— মানব সেবার আলোকবর্তিকা।

তখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। সেখানে ইউরোপীয় মানুষদেরই দাপট। নেটিভদের চিকিৎসা ভালো হয়

না। তিনি ভাবলেন, একটা মেডিক্যাল কলেজ যদি করা যায়, তাহলে দেশের মানুষগুলো একটু চিকিৎসা পায়।। কিন্তু কে দেবে এত টাকা? নিজের সব দিয়েও তো একটা কলেজ ও হাসপাতাল করা সম্ভব নয়। তখন নিজে হাসপাতাল তৈরি করার জন্য ভিক্ষা করতে শুরু করলেন বড়োলোকদের দ্বারে দ্বারে। বড়োলোকের বাড়ির বিয়ের অনুষ্ঠান। বিলেত ফেরত ডাক্তারবাবু গেটের মুখে দাঁড়িয়ে বলছেন— 'কিছু অর্থ সাহায্য করুন। একটা হাসপাতাল বানাবো।' চেনেন না কেউ তাঁকে। কেউ মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছেন, কেউ-বা পকেট থেকে টাকা বের করে দিচ্ছেন। এইভাবে তিনি হাসপাতালের জন্য টাকা তুলতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন তাঁর স্বপ্ন সফল হলো। কলকাতার বেলগাছিয়ায় ভারতবর্ষের প্রথম বেসরকারি অ্যালবার্ট ভিক্টর কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলেন। সে এক বিস্ময়। শুরু হলো পথ চলা। এর পর কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলাভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্রের বই লিখলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, দেশীয় ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা শুরু করতে পারলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

তারপর একদিন আচমকা ১৯১৮ সালে ইহলোক ত্যাগ করলেন এই মহামানবটি। মৃত্যুর আগে নিজের সর্বস্ব দান করে গেলেন তাঁর মেডিক্যাল কলেজকে। পড়ে রইল শুধু বসতবাটিটুকু। ১৯৪৮ সালে তাঁর তৈরি সেই হাসপাতালের নামকরণ করলেন আর এক ডাক্তার পশ্চিমবঙ্গের তাৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। হাসপাতালের নাম হলো 'আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'।

সেই ডাক্তারবাবুটির নাম রাধাগোবিন্দ কর (১৮৫২, ২০ আগস্ট)। তিনি জীবনটা অন্যভাবে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এরা যে দুহাত উজাড় করে বিলোতেই আসেন, বিনিময়ে কিছুই চান না। ফুলেদের তো সৌরভ ছড়ানোতেই আনন্দ!

**ডাঃ প্রকাশ মল্লিক**

## ভারতের বিপ্লবী

# মতিলাল মল্লিক

বিপ্লবী মতিলাল মল্লিকের জন্ম ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার দেওভোগে। বিপ্লবীদলের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সঙ্গীদের সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহ করে ফেরার সময় ব্রিটিশ বাহিনী ও ভিলেজ গার্ডদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মতিলালের গুলিতে সরকারি বাহিনীর নেতা নিহত হয়। মতিলালও গুরুতর আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এবং সঙ্গীদের নাম জানার চেষ্টায় তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার করে ব্যর্থ হয়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর তাঁর ফাঁসি হয়।

## জানো কী?

- বেদে গোরুকে অঘ্ন্যা অর্থাৎ অবধ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- চীনের লেখকরা ভারতকে ইয়িন-টু অথবা থিয়িন-টু নামে উল্লেখ করেন।
- মনুস্মৃতি আইন সম্পর্কিত গ্রন্থ।
- ভারতে নাট্যশাস্ত্রের জনক বলা হয় ভরতমুনিকে।।
- প্রথম পরিবেশিত নৃত্যনাট্য হলো কৃষ্ণগীতি (সংস্কৃত)।
- রবীন্দ্র সংগীত শব্দবন্ধটি চালু করেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক।।
- সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন মা সরস্বতী।

## ভালো কথা

# অটোচালকের সততা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নুঙ্গী এলাকার বাসিন্দা সেখ রবিয়াল। একজন অটোচালক। একজন অটোচালকও যে বড়ো মনের মানুষ হন তার প্রমাণ তিনি নিজেই রেখেছেন গত এপ্রিল মাসের বারো তারিখে। সেদিন রাত সাড়ে আটটায় বজবজ প্লাস্টার মোড় থেকে এক ভদ্রলোক তাঁর অটোতে ওঠেন। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভদ্রলোক অটোতেই তার ব্যাগটি ফেলে যান। ব্যাগে ল্যাপটপ ও দু'লক্ষ ছিল। বাড়ি গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন যে ব্যাগটি অটোতে ফেলে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বজবজ ফাঁড়ি ও মহেশতলা থানায় বিষয়টি জানান। এদিকে অটোচালক বাড়ি গিয়ে অটোতে ব্যাগটি দেখে সব বুঝতে পারেন।। পরদিন সোজা মহেশতলা থানায় গিয়ে পুলিশের হাতে ব্যাগটি তুলে দেন। ব্যাগের মালিক ও পুলিশ একজন অটোচালকের সততা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। ব্যাগের মালিক পাঁচহাজার দিতে চাইলেও তিনি নেননি। একজন অটোচালকের সততায় মুগ্ধ হয়ে পুলিশ তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মানিত করেন।

**সায়ন মণ্ডল**, দ্বাদশ শ্রেণী, মহেশতলা, দঃ ২৪ পরগনা।

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## কবিতা

# চির নতুন

**অনামিকা পাল, অষ্টম শ্রেণী, শিলচর, অসম।**

সেই ছেলেটি ছিল মা-হারা
সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল এক তারা।
থাকতো ভীষণ খেয়ালি মনে
চুপ করে থাকতো না ঘরের কেণে।
সারা পৃথিবী হলো তার ভাবনার সংসার
আজ তাঁকে জানাই কোটি কোটি নমস্কার।
পঁচিশে বৈশাখ তিনি এলেন এই পৃথিবীতে
সেই সুবিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।
পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার আরও কত মান
ত্যাগ করেছিলে নাইট সম্মান।
এই দুর্দিনে তুমি কেনো আছো ইতিহাসের পাতা
ভরে
এসো না একবার আমাদের কাছে ফিরে।

**কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

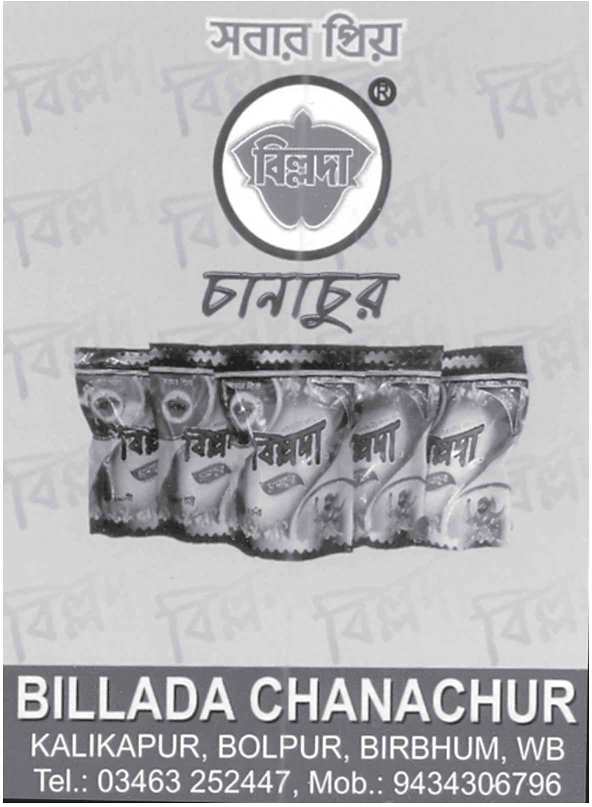


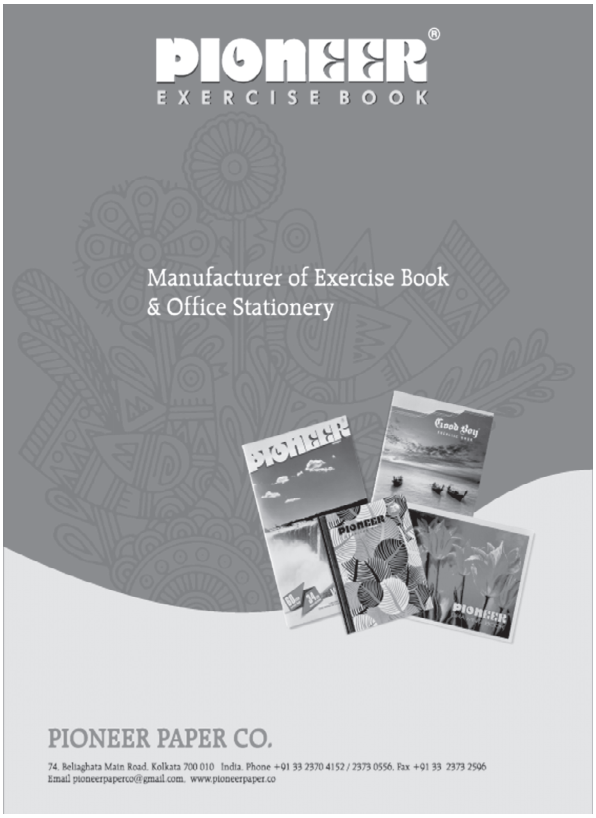


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব**
**কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

## বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

***নিউ কমল ব্রাণ্ডের***
***ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।***
**মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।**

**শান্তিনিকেতন, বোলপুর,**
**মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫**

মিসিং লিংক

# সুলতান মামুদকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এক বাঙ্গালি

**সন্দীপ চক্রবর্তী**

সুলতান মামুদের নাম শুনলে এখনও অনেকের মেরুদণ্ড দিয়ে হিমেল স্রোত বয়ে যায়। বস্তুত, এমন রক্তলোলুপ লুটেরা বিশ্বের ইতিহাস খুব কমই দেখেছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে মামুদ ও তার সেনাবাহিনী খুবই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু কতটা শক্তিশালী ছিল? ভারতের কোনও হিন্দু রাজা কী তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেননি? আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে যেরকম ধারণা দেওয়া হয় ঠিক সেরকম, অর্থাৎ, মামুদ কি বিনা বাধায় একের পর এক ভারত অভিযান করেছে? এবং সোমনাথ ও মথুরা-সহ একাধিক মন্দির লুটপাট ও ধ্বংস করে, জনপদগুলিকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে? এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রথম প্রশ্ন, মথুরায় লুটপাট করার পর মামুদের প্ল্যান ছিল বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির আক্রমণ করার। কিন্তু সে ইচ্ছে পূরণ হলো না কেন? কারণ বাধ সেধেছিলেন এক বাঙ্গালি।

সেই বাঙ্গালির নাম গৌড়েশ্বর মহীপালদেব। আজকের বাঙ্গালির হতশ্রী অবস্থা দেখে কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত। বাঙ্গালি করবে যুদ্ধ, তাও আবার সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে! কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্যি। মহীপালদেব যে সুলতান মামুদকে বারাণসীর উপকণ্ঠে এক যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন তার তিনটে প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। প্রথম প্রমাণ, মামুদকে যুদ্ধে হারানোর পর মহীপালদেব বারাণসীতে শতাধিক ঈশান চিত্রঘণ্টা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে একটি মন্দিরে একটি শিলালেখ উৎকীর্ণ করেছিলেন মহীপালদেব। শিলালেখতে পাওয়া যাবে মামুদের পরাজয়ের প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রমাণ মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল ব্যায়হাকির বিবরণ। ব্যায়হাকির গ্রন্থের নাম তারিখ-ই-ব্যায়হাকি। তৃতীয় প্রমাণ আর্যক্ষেমেশ্বর রচিত চণ্ডকৌশিক। এই গ্রন্থে লেখক মহীপালদেবকে চন্দ্রগুপ্ত-স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, আর্যক্ষেমেশ্বর বর্ণিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নন। ইনি গুপ্ত বংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। হুনদের পরাজিত করে বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। হুনরা ছিল বিদেশি শক্তি, সুলতান মামুদও তাই। মহীপালদেবের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের তুলনা করার কারণ বুঝতে অসুবিধে হয় না।

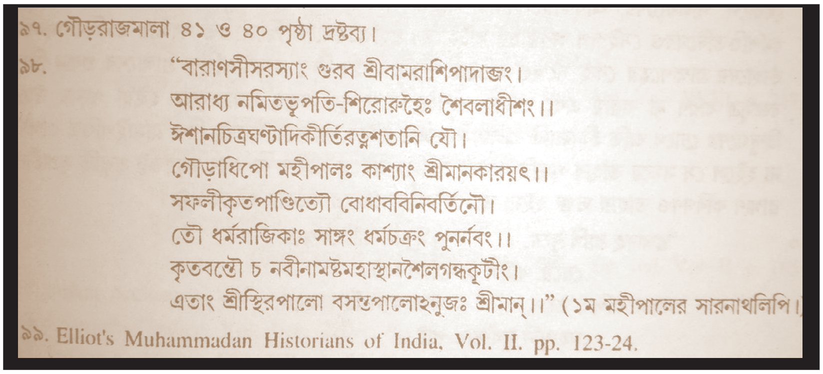
৯৭. গৌড়রাজমালা ৪১ ও ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৯৮. "বারাণসীসরস্যাং গুরব শ্রীবামরাশিপাদাব্জং।
আরাধ্য নমিতভূপতি-শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশং।।
ঈশানচিত্রঘণ্টাদিকীর্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপালঃ কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ।।
সফলীকৃতপাণ্ডিত্যৌ বোধাববিনিবর্তিনৌ।
তৌ ধর্মরাজিকাঃ সাঙ্গং ধর্মচক্রং পুনর্নবং।।
কৃতবন্তৌ চ নবীনামষ্টমহাস্থানশৈলগন্ধকূটীং।
এতাং শ্রীস্থিরপালো বসন্তপালোঽনুজঃ শ্রীমান্।।" (১ম মহীপালের সারনাথলিপি।)
৯৯. Elliot's Muhammadan Historians of India, Vol. II. pp. 123-24.

মহীপালদেব যে সময়ে গৌড়ের শাসনভার গ্রহণ করেন সেটি পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সংকটকাল হিসেবে চিহ্নিত। গৌড় থেকে এই সাম্রাজ্যের উত্থান অথচ সেখানেই তারা তখন একরকম কোণঠাসা। চারিদিকে চোল, চান্দেলা, মালওয়া, গাড়ওয়াল ও কামরূপের মতো শক্তিশালী রাজ্য। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত দেশীয় রাজারা। কে কার রাজ্যের সীমা কতটা বাড়িয়ে নিতে পারে, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। এইরকম কঠিন সময়ে সিংহাসনে বসে মহীপালদেব প্রথমেই নিজের রাজ্যের সীমা অক্ষত রাখার দিকে নজর দিলেন। তখন পাল সাম্রাজ্য উত্তরে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত। বারাণসীতেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো মামুদের।

মহীপালদেব ও সুলতান মামুদের যুদ্ধের প্রসঙ্গে যাবার আগে তার পটভূমিটা বোঝা দরকার। ১০১৩ সালে মামুদ পেশোয়ার আক্রমণ করে। তখন এখানকার রাজা আনন্দপাল। কেউ কেউ মনে করেন এই আনন্দপাল পালবংশের রাজা। যদিও বেশিরভাগ রেকর্ডে তাঁকে শাহি সাম্রাজ্যের রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শাহি সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পেশোয়ারের কাছে ওয়ারহিন্দে। মামুদের সঙ্গে আনন্দপালের যুদ্ধও হয় এখানে। যুদ্ধে পরাজিত হন আনন্দপাল। কিন্তু এখানে একটা গল্প আছে।

ফঃ ৬

আনন্দপাল পরাজিত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু রণকৌশলের কারণে নয়, সেদিন মামুদ জিতেছিলেন স্রেফ ভাগ্যের জোরে। যুদ্ধে আনন্দপাল জিতেই গিয়েছিলেন। মামুদের সেনা তখন রীতিমতো কোণঠাসা। হাতির পিঠে চড়ে আনন্দপাল এগিয়ে চলেছেন মামুদের বাহিনীর দিকে। ঠিক সেই সময় এক ঝাঁক তির উড়ে আসে হাতির দিকে। হঠাৎ আক্রমণে দিশেহারা হাতি পিছন ফিরে দৌড়তে শুরু করে। এই দৃশ্য দেখে আনন্দপালের সেনাদের ধারণা হয়, রাজা নিশ্চয়ই মারা গেছেন। নয়তো মাহুত হঠাৎ হাতিকে পিছন দিকে নিয়ে যাবে কেন? তারা প্রাণভয়ে পালাতে শুরু করে। মামুদ হেরে-যাওয়া যুদ্ধ ফাঁকতালে জিতে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাতির পাগলামির জন্য হিন্দু রাজার পতনের ঘটনা এই প্রথম নয়। কিন্তু আগের ঘটনা থেকে পরবর্তী রাজারা যে কিছু শেখেননি বা হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার ভুল যে তারা সংশোধন করেননি, তা বলাইবাহুল্য।

ওয়ারহিন্দের যুদ্ধ জেতার পর মামুদ মথুরা আক্রমণ করল। তাকে বাধা দিয়েছিল উত্তর ভারতের রাজাদের সম্মিলিত বাহিনী। কিন্তু তারা পরাজিত হলেন। মথুরার কৃষ্ণমন্দির লুট করল মামুদ। কয়েক হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করল তার সেনারা। মথুরা জয় করার পর মামুদ চলল বারাণসীর দিকে। এবার লক্ষ্য কাশী বিশ্বানাথ মন্দির।

গৌড়েশ্বর মহীপালদেব যখন শুনলেন বারাণসী আক্রান্ত হতে পারে, তখন শৈবভূমির পবিত্রতা রক্ষাই হয়ে উঠল তাঁর একমাত্র বিচার্য বিষয়। তৎক্ষণাৎ তিনি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে সুবিশাল গৌড়ীয় বাহিনী। বারাণসীর উপকণ্ঠে মারাত্মক যুদ্ধ হলো। সন্ধ্যে তখন হব হব, মামুদের সর্বশেষ প্রতিরোধটিও ভেঙে পড়ল। এক বাঙ্গালির কাছে হার মানল মামুদ। সে যাত্রায় রক্ষা পেল বারাণসী। মামুদ ফিরে গেল কনৌজের দিকে। আবুল ফজল ব্যায়হাকি লিখেছেন, 'ফিরে গেল'। আসলে পালিয়ে গেল। প্রশ্ন হলো, মহীপালদেবের মতো রণকুশলী রাজা মামুদকে পালিয়ে যেতে দিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। ভারতীয় রাজাদের মাইন্ড সেটে একটা সমস্যা আছে। সামনে নতজানু হয়ে বসে থাকা মহম্মদ ঘোরি বা মামুদ যতই ক্ষমাভিক্ষা করুক, এদের কোর্টমার্শাল না করে ছেড়ে দিলে এরা যে পরের বার ফিরে এসে ভারতবর্ষকে শ্মশান করে দিতে পারে— সে কথা তাঁরা জানতেন না তা নয়, তবুও ছেড়ে দিতেন। পৃথ্বীরাজ চৌহান দিয়েছেন, মহীপালদেবও সম্ভবত দিয়েছেন। এই সন্ন্যাসীসুলভ মনোভাব অহিংসা পরমো ধর্মের প্রভাব কিনা কে জানে! তবে প্রভাব যারই হোক ভারতবর্ষ যে তার মাশুল বারবার দিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গ। আমাদের ইতিহাস বইয়ে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে সুলতান মামুদ অপরাজেয়। তাকে যুদ্ধে হারানো অসম্ভব, বিশেষ করে মহীপালদেবের মতো রাজার পক্ষে। মামুদ সত্যিই অপরাজেয় কিনা জানার জন্য তার মনস্তত্ত্ব নিয়ে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন। অপরাধবিজ্ঞানে কে খুন করেছে জানার জন্য খুনের মোটিভ ও খুন করার সুযোগ— এই দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমরাও জানার চেষ্টা করব মামুদের মোটিভ বা উদ্দেশ্যটা ঠিক কী? মামুদের একের পর এক ভারত-অভিযানের ধরন দেখে স্পষ্টতই অনুমান করা যায় যে, সে এ দেশে থাকতে আসেনি। এমনকী কোনও দেশীয় রাজার রাজ্য জয় করে রাজা হতেও আসেনি। সে এসেছিল লুটপাট করতে। সাধারণত চোর-ডাকাতেরা চুরি করার জন্য দুটি সময়কে বেছে নেয়। গভীর রাতে যখন বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে থাকে অথবা বাড়িতে যখন কেউ থাকে না। অর্থাৎ যে-বাড়িতে ডাকাতি করা হবে সেটি যখন যথেষ্ট সুরক্ষিত নয় তখনই ডাকাতেরা তাদের কাজ সেরে ফেলে। ডাকাতদের এই মনস্তত্ত্ব মামুদের মধ্যেও দেখা যাবে। সে মূলত আক্রমণ করেছিল ভারতের সমৃদ্ধ মন্দির-নগরীগুলো। আরও সংক্ষেপে বললে, বড়ো বড়ো মন্দিরগুলোই ছিল তার টার্গেট। সেই সময় ভারতের সব রাজাই হিন্দু। তারা ছুঁতোনাতা কারণে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে পারেন কিন্তু হিন্দু হয়ে সোমনাথ মন্দির লুট করার বা মথুরার কৃষ্ণমন্দির ধ্বংস করার প্রবৃত্তি কোনওদিনই তাদের হয়নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, মন্দিরগুলি সেইসময় যথেষ্ট সুরক্ষিত থাকত না। স্থানীয় রাজা মন্দিরের কাছাকাছি ছোটোখাটো সেনাচৌকি তৈরি করার কথাও সম্ভবত ভাবেননি। এই প্রশাসনিক শিথিলতার সুযোগই মামুদ নিয়েছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সোমনাথ মন্দির বারবার আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলো না? এই প্রশ্নের উত্তর এটাই, ভারতবর্ষ সেইসময় অনেক ছোটো বড়ো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ছোটো রাজ্যগুলির গুপ্তচর বিভাগ তত সক্রিয় ছিল না। ফলে মামুদের পরিকল্পনা আগেভাগে জানার কোনও উপায়ই ছিল না। সেই সঙ্গে ছিল দুইপক্ষের যুদ্ধকৌশলের তফাত। মামুদ লুকিয়ে চুরিয়ে যুদ্ধে (গেরিলা যুদ্ধ) পারদর্শী। কিন্তু ভারতের সেই সময়কার হিন্দু রাজারা এই কৌশল অবলম্বন করতেন না। অনেক পরে ভারতীয় রাজাদের মধ্যে শিবাজী ও রাণা প্রতাপ গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সব শেষে যা না বললেই নয় তা হলো, রাজাদের পারস্পরিক ঈর্ষা। একজন রাজা আক্রান্ত হলে অন্য কোনও রাজা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসতেন না। কোনও রাজা যদি তাঁর নিজের রাজ্য থেকে দূরে মামুদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে দ্বিতীয় এক রাজা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথম রাজার রাজ্য আক্রমণ করতেন। উদ্দেশ্য, অরক্ষিত রাজ্যটি দখল করা। এমনটি ঘটেছিল মহীপালদেবের ক্ষেত্রেও। মহীপালদেব যখন বারাণসীকে বাঁচাতে মামুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, ঠিক সেই সময় দক্ষিণের চোল বংশের রাজা রাজেন্দ্র চোল গৌড় আক্রমণ করেছিলেন। যদিও সে যাত্রায় গৌড়ীয় সেনার দাপটে তাঁকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল কিন্তু দেশ বাঁচানোর যুদ্ধে হিন্দুরা কেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি তাঁর উত্তর সেদিন তিনিই দিয়েছিলেন। পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবই ছিল এর প্রধান কারণ। যদি সেই সময় ভারত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা সমুদ্রগুপ্তের মতো কোনও একজন শক্তিশালী চক্রবর্তী সম্রাটের শাসনে থাকত তাহলে এদেশের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। □

# নতুন শিক্ষানীতি শিশুকে করে তুলবে মুক্তমনা

**ভারতের বিজেপি সরকার স্বদেশী ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভকে উচ্চস্তরে নিয়ে যাবার শপথ নিয়েই তা বলবৎ করবার চেষ্টা করে যাচ্ছে সমানে।**

**শেখর সেনগুপ্ত**

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা বহু বছর ধরে বিবিধ অব্যবস্থার হেপাজত থেকে মাত্র বছর দুয়েক আগে মুক্তি পেলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সুচিন্তিত শিক্ষনীতির কল্যাণে। যদিও আমাদের এই রাজ্যে বিষয়টি নিয়ে যথার্থ বিশ্লেষণ আজ অবধি নজরে আসেনি হয়তো এই কারণে যে, কেন্দ্রের ইতিবাচক কার্যাদি নিয়েও কলম শানানোকে প্রকৃত শিক্ষিত জনও প্রায় প্রাণ বা মানহানিকর কর্মরূপে ভয় পেয়ে থাকেন। ১৯৮৬ সনে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হবার পর নয়-নয় করে ৩৪ টা বছর অতীত হয়ে গেল। হরেক কিসিমের স্বার্থ ও সামর্থ্য আগলাতে আগলাতেই সরকারের দম শেষ। পাকাপাকিভাবে একটি আদর্শ ও দেশের পক্ষে, দশের পক্ষে কল্যাণকর কোনও নব শিক্ষানীতির প্রবর্তনের কথা তাঁদের মগজে যে স্থান পায়নি, এটাই ঐতিহাসিক সত্য। নরেন্দ্র মোদীকে তাই অকপট শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, — তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার আর পাঁচটা সংস্কারের সঙ্গে দেশের শিক্ষানীতি নিয়েও অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ২০২০ সালে প্রবর্তিত করলেন দেশজুড়ে এমন এক শিক্ষানীতি, —যা এই দেশের নাগরিকদের তথা ভবিষ্যতের জনতার পক্ষে সন্দেহাতীত ভাবে কল্যাণদায়ক এবং যথার্থ আধুনিক। পূর্ববর্তী শিক্ষানীতি ছিল অনেকাংশে অসম্পূর্ণ এবং তাকে মুড়ে রেখেছিল একাধিক অস্বচ্ছতাও। সেই শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন ও স্বচ্ছতা আনতে অনেক ভাবতে হয়েছে খুঁটিনাটি নিয়ে, যে কারণে এর সার্বিক রূপায়ণে সময় অনেকটাই লাগতে পারে। যেহেতু আমি প্রথম যৌবনে শিক্ষাজগতেই

ছিলাম, তাই আমার চিন্তাধারা ও অনুমান কনজিস্টিভ নয় বলেই প্রত্যয়। নতুন শিক্ষানীতি চালু হবার পর দুটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এই সময়ে বিজেপি সরকার নতুন শিক্ষানীতির ভিত কয়েকটি রাজ্যে যে বেশ কার্যকরী করতে পেরেছে, তার সবুদ আমি পেয়েছি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সাম্প্রতিক রেকর্ড নিজস্ব চর্চায় এনে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, আমি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের পতাকাবাহক নই এবং আজ অবধি নির্বাচনী প্রপাগান্ডায় কোনও ব্যক্তি আমার সক্রিয়তা কদাপি প্রত্যক্ষ করেননি।

নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকার যে তত্ত্বে ও কর্মে সমান জোর দিয়ে চলেছে, ভারতের একাধিক রাজ্যে তা প্রতিভাত। ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি মোতাবেক সরকার যে বিষয়গুলিতে প্রাধান্য দিয়েছে এবং তজ্জনিত প্রভাবে অগ্রগতিও হয়ে উঠছে নিশ্চিত, আমি এখানে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি, যাদের রূপায়ণের তৎপরতাকে অস্বীকার করতে পারি না :

(১) শিক্ষার ব্যাপ্তিকে বিস্তারিত করতে এখন আর সরকারি অর্থের অভাব ঘটছে না। এই সাহায্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় শিক্ষাগত উদ্যমেই লভ্য।

(২) শিক্ষার গঠনাত্মক মূল্যায়ন করতে প্রতিষ্ঠিত, সুপরিচিত শিক্ষাবিদদের অভিমতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

(৩) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সর্বাধিক, তা নির্ণয় করে তাঁকে সেই বিষয়েই শিক্ষিত করে তোলার দিকে অগ্রসর হতে হবে। তাঁর নিকট যা প্রায় অজ্ঞাত কিংবা যা তার সদ্যশেখা, সেটাকে কেরিয়ার তৈরির নামে কণ্ঠে যেন জড়িয়ে দেওয়া না হয়।

(৪) বৃত্তিমূলক এবং কেতাবি— উভয় শিক্ষাকেই সমমর্যাদা দিতে হবে। মান্যতা প্রদানে তাদের পৃথক করে রাখাটা অনুচিত।

(৫) গবেষণা হবে ধারাবাহিক, ঐতিহ্যের সঙ্গে বাস্তবের সহাবস্থান এবং

কর্মনিপুণতার মূল্যায়নে সহায়ক।

(৬) সরকারি, বেসরকারি— উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান এই সরকারের অন্যতম দায়বদ্ধতা।

(৭) যে বিষয়ে বৈচিত্র্য আছে, আবার যা নাগরিকদের জীবনেও গঠনমূলক ছন্দ আনবে, সেই বিষয়কেই শিক্ষণীয়রূপে তুলে আনতে হবে শীর্ষে।

(৮) সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণী অবকাশ ও যুক্তির প্রাধান্য— এই তিনের সংমিশ্রণে যেন চালিত হয় দেশের সর্ববিধ শিক্ষাব্যবস্থা।

(৯) মুখস্ত বিদ্যার চেয়ে অধিগত/অর্জিত বিদ্যা যেন অধিকতর মর্যাদা লাভ করে। অধিগত/অর্জিত বিদ্যার গুরুত্ব ইয়ত্তাহীন।

(১০) দেশের সকল ভাষারই প্রসার, চর্চা ও উন্নয়ন হয়ে থাকে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে। শিক্ষিত জন যেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পাঠাভ্যাস ত্যাগ না করেন।

(১১) শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দানুসারে আপন আপন শিক্ষার নির্বাচন করবেন। তবে সেই মহাভারতের কাল থেকে এই দেশে যে ঐতিহ্য প্রবহমান, তাকে পাশ কাটাবে না বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা।

(১২) Grde-3 স্তরে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান নয়, গণিতকেও আয়ত্তে আনতে হবে।

(১৩) শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য দেশকে গৌরবান্বিত করা এবং জাতিযুদ্ধের বিষ মুছে ফেলা।

(১৪) কেবলমাত্র প্রথা ও নিয়তির ওপর নির্ভরতা নয়, শিক্ষাদানে ব্যাপক প্রয়োগ ঘটবে আধুনিক প্রযুক্তির।

(১৫) শিক্ষাদানে থাকবে না ভাষাগত বৈষম্য। অধিকাংশ ভারতীয় ভাষাই হয়ে উঠবে শিক্ষাদানের উপযুক্ত। বাহারি মরশুমি ফুলের ন্যায় আকর্ষক হয়ে উঠুক ভারতের ভাষা ও সাহিত্য।

(১৬) শিক্ষা হবে ভারমুক্ত, আকর্ষক, কার্যকরী।

২০২০ সালে ভারত সরকারের নব শিক্ষানীতি এই ১৬টি দিশার দিশারী। শিক্ষাদানের সূচনা হতে পারে শিশুর বয়স তিন বছর পূর্ণ হলেই। সেই শিক্ষাই শিশুকে করে তুলবে মুক্তমনা ও ন্যায়বোধে সচেতন। শিক্ষার কোনও স্তরকেই আটপৌরে গণ্য করা উচিত হবে না। ইংরেজিতে যাকে আমরা বলে থাকি Multi disciplinary Education, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সেটাই হবে গঠন— যার প্রবর্তনে খানিক এগিয়ে আবার পিছিয়ে আসা অকাম্য। টুকটাক বিষয়গুলিতেও গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে সরকারি প্রয়াসে নিষ্ঠার সঙ্গে গড়ে উঠবে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে গবেষণা। সৃষ্টিমুখী গবেষণাই তো জাতির জীবনে এনে থাকে কল্যাণদায়ী প্রসন্নতা।

সরকারের সুচিন্তিত শিক্ষানীতিতে এই গবেষণাপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নামকরণ করা হয়েছে Multidisciplinary Educational Research University, সংক্ষেপে, MERU. শিক্ষায় থাকবে সমদর্শিতা। রাজনীতি অথবা গোষ্ঠীগত ভেদাভেদের মৃদুতম উপস্থিতিও যেন সেখানে না থাকে। প্রতিটি এমত শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনায় নিযুক্ত হবেন সেই সকল প্রকৃত বিদ্বানরাই, যাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতাও প্রশ্নাতীত। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার মূলস্রোতে না আনতে পারলে আত্মনিগ্রহের পথকেই মসৃণ করা হবে। পড়ুয়াদের দক্ষতকে স্বীকৃতি দেবে সঠিক শংসাপত্র। সর্বস্তরের ছেলে-মেয়েরাই যাতে ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক স্তর অবধি লেখাপড়া করতে পারে, তার দায়িত্ব প্রতিটি রাজ্যকে নিতে হবে রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের ভাবনাজনিত দুর্বলতাকে দমন করে। ছাত্র-ছাত্রীরা যেন বুঝতে পারে, শিক্ষাকে পরিহার করা মানে সৌভাগ্যের ঊর্ধ্বলোকের পৌঁছে যাবার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা। একজনের শিক্ষা প্রতিফলিত হবে তাঁর আচার-আচরণে। শিক্ষা দেবে তাঁকে চারিত্রিক সততা ও দৃঢ়তা, যদিও তিনি সমাজে মধুভাষীরূপেই পরিচিতি অর্জন করবেন। যিনি এই বিষয়চর্চায় অনিচ্ছুক, তাঁকে শিক্ষিতরূপে পরিচিতি লাভের গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না। নতুন শিক্ষানীতির এইটি অন্যতম নেপথ্য সত্য। আর দায় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের। শিক্ষা লাভের পথে থাকবে যুগপৎ আনন্দ ও শৃঙ্খলাবোধ। থাকবে দেশপ্রেমও। থাকবে না জাতি বা ধর্মবিদ্বেষ। সরকারের এই শিক্ষাসূচির নাম দেওয়া হয়েছে School Inovation Ambassador Training Programme, সংক্ষেপে SIATP. পড়ুয়াদের নিত্য সাহচর্য দিচ্ছেন যে সকল শিক্ষক এবং শিক্ষিকার, তাঁদের প্রত্যেককে ধীরে ধীরে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ যেন আবার ক্লান্তিকর না হয়। এই নিরিবিলি অনুশীলনের জন্য নব শিক্ষানীতিতে যে পাঁচটি মডিউলকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারা হলো :

(১) চিন্তা ও ভাবনাকে দস্তুরমতো প্রসারিত করা।

(২) উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ও বিন্যাস।

(৩) নিজস্ব মেধা ও একাগ্রতাকে নিয়মিত চর্চার মধ্যে রাখা।

(৪) মানুষই যে দেশের সেরা সম্পদ, এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। বিস্তর টাকাপয়সার মালিক হওয়া, নতুন মডেলের গাড়ি, প্রাচুর্যভরা দিনাতিপাত— এইগুলি অর্জন করাই শিক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না।

(৫) শিক্ষাতে কোমল ছোঁয়া যেমন থাকবে, তেমনি সেই বিদ্যা হবে গঠনমূলক; উৎকর্ণ হয়ে শুনতে হবে ঐতিহ্যের গুণাগুণ, —যা অর্জনে থাকবে না কোনও জড়তা। বিদ্যা হবে প্রকৃত গঠনমূলক, নিছক বিপণনের প্রস্‌পেক্টাস নয়।

ভারত সরকার চায় শিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণও। ভিন্‌দেশী শিক্ষার্থীরা এ দেশে এসে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ অবশ্যই পাবেন এবং তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও নজর রাখা হবে। আবার বিদেশে পাঠগ্রহণে ইচ্ছুক ভারতীয়রাও পারেন সরকারের অকাতর ঔদার্য। নব মানে সমৃদ্ধ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি অন্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রে নিজেদের শাখা স্থাপনে আগ্রহী নয়, সরকারি অনুমোদন লাভের জন্য তাদের ভুগতে হবে না।

অর্থাৎ বিশদ আলোচনায় না গিয়েই বলতে পারি, ভারতের বিজেপি সরকার স্বদেশী ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভকে উচ্চস্তরে নিয়ে যাবার শপথ নিয়েই তা বলবৎ করবার চেষ্টা করে যাচ্ছে সমানে।

*(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক)*

# ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য, পর্যটন ও বিনিয়োগ মন্ত্রী ড্যান তেহান একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে ভারত-অস্ট্রেলিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য চুক্তি (ইন্ডওস ইসিটিএ) স্বাক্ষর করেছেন। এক মাসের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয় বৈঠক। এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন এত অল্প সময়ের মধ্যে চুক্তি এবং ইন্ডওস ইসিটিএ স্বাক্ষর করা দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার গভীরতা প্রদর্শন করে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের মতে, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইন্ডওস ইসিটিএ কর্মসংস্থান, অধ্যয়ন ও ভ্রমণের সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। ভারত- অস্ট্রেলিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি বা ইসিটিএ হলে একটি ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি যা পণ্য ও পরিষেবা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। দুই দেশের মধ্যে শিক্ষার্থী, পেশাজীবী ও পর্যটকদের আদান- প্রদান সহজতর হবে। এটি পণ্য ও পরিষেবার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে বাড়িয়ে তুলবে, পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

# প্রথম বাণিজ্যিক উড়ান হিসেবে ডিব্রুগড় থেকে পাসিঘাট যাত্রা ভারতীয় বিমানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ কেন্দ্রীয় সরকার যোগাযোগের উপর জোর দিয়েছে এবং এই প্রচেষ্টার ফল হলো উড়ান প্রকল্প। এই প্রথমবার অ্যালায়েন্স এয়ার বাণিজ্যিক ফ্লাইটে একটি দেশীয়ভাবে প্রস্তুত ডর্নিয়ার বিমান ব্যবহার করেছিল। ১২ এপ্রিল ডিব্রুগড় ও পাসিঘাটের মধ্যে উড়ান চলাচলের জন্য ডর্নিয়ার ২২৮ বিমান ব্যবহার করা হয়েছিল। সতেরো জনের আসন ক্ষমতা সম্পন্ন ডর্নিয়ার-২২৮, দিনে ও রাতে কাজ করতে সক্ষম এবং এটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক সংযোগ ও যোগাযোগ উন্নত করবে। শুধু তাই নয়, এই বিমানটি পার্বত্য এলাকায় ছোটো রানওয়ে থেকে যাত্রা এবং অবতরণও করতে পারে।

# বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির পথে ভারত

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ কোভিড অতিমারি এবং রাশিয়া ইউক্রেন সংকটের সময়ও দেশের অর্থনীতি মজবুত ছিল। গ্লোবাল কনসালটিং ফার্ম কেপিএমজি-র মতে ২০২২ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলির মধ্যে থাকবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতের বৃদ্ধির হার ৯.২ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭.৭ শতাংশ হতে পারে। কেপিএমজির মতে, ভারত সরকারের বর্তমান নীতি অর্থনৈতিক গতিকে অব্যাহত রাখবে। এই খাতে পরিকাঠামো শক্তিশালী এবং বিনিয়োগের উপর জোর দেওয়া শুধু বৃদ্ধিই ত্বরান্বিত করবে না, এর ফলে বেকারত্বও কমবে। কেপিএমজি-র মতে, করোনার পর ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের হার ত্বরান্বিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের অগ্রগতি ও চাহিদা বৃদ্ধির ফলে গতিশীলতা সূচক, প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ এবং বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে শিল্প সংস্থা ফিকি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৭.৪ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে।

# স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করতে ১০১টি নতুন প্রতিরক্ষা পণ্যের স্বদেশীকরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ প্রতিরক্ষা খাতে স্বদেশীকরণকে উৎসাহিত করে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হওয়ার পথে আরও একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৭ এপ্রিল ১০১টি প্রতিরক্ষা পণ্যের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, যেখানে পাঁচ বছরের জন্য আমদানি নিষিদ্ধ এবং পণ্য ক্রয় ভারতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। এসব পণ্য আমদানির পরিবর্তে এখন দেশেই তৈরি করা হবে। ২০২০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত দুটি তালিকা জারি করে ২০৯টি অস্ত্র আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২০২০ সালের আগস্টে প্রথম তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তারপরে ২০২১ সালের মে মাসে দ্বিতীয় তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটি লক্ষণীয় যে বহুকাল ধরে ভারত বিশ্বের মধ্যে অন্যতম অস্ত্র ক্রেতা ছিল। একারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ‘আত্মনির্ভর ভারত’ উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভরতার উপর জোর দিয়েছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহের মতে, ‘এই তিনটি তালিকা প্রকাশের জন্য সরকারের অনুপ্রেরণা হলো দেশীয় শিল্পের ক্ষমতা শক্তিশালী করা।’ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের চাহিদা মেটানো ছাড়াও, এটি আন্তর্জাতিক মানের সরঞ্জাম রপ্তানি করবে। এটি প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করে দেশীয় গবেষণা ও উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

# ভারতের কৃষি রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেকর্ড স্পর্শ করেছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ কোভিড-১৯ অতিমারির মতো অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতেও ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতের কৃষি রপ্তানি প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০.২১ মার্কিন বিলিয়ন হয়েছে, যা কৃষি রপ্তানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ। রপ্তানিজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে রয়েছে সামুদ্রিক ও কৃষিজাত পণ্য। ডিরেক্টরেট জেনারেল অব কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস (ডিজিসিআইএস) অনুসারে, ভারত চালের ক্ষেত্রে বিশ্ব বাজারের প্রায় ৫০ শতাংশ দখল করেছে। ২০২১-২২ সালে চালের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, যেখানে গম রপ্তানি বেড়েছে ২.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গম ২৭৩ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০২০-২১ সালে ৫৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ সালে ২১১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। চিনি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪.৬ বিলিয়ন এবং অন্যান্য দানাশস্যের পরিমাণ ছিল ১.০৮ বিলিয়ন। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কৃষকরা চাল, গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য রপ্তানি করে উপকৃত হয়েছেন। সামুদ্রিক পণ্যের রপ্তানিও এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ যা হলো ৭.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, কেরল, মহারাষ্ট্র, এবং গুজরাট তথা উপকূলীয় রাজ্যগুলির কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন। মশলা রপ্তানি টানা দ্বিতীয় বছরে ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কফি রপ্তানি এই প্রথমবার এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে, যার থেকে কর্ণাটক, কেরল ও তামিলনাড়ুর কফি চাষিরা লাভবান হয়েছেন।

# মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষস্থানে পশ্চিমবঙ্গ

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** মূল্যবৃদ্ধির হারে দেশের শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। সম্প্রতি জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে প্রকাশ, রাজ্যওয়াড়ি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির হার দেশের মধ্যে

সবচেয়ে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির হার ৯.১২ শতাংশ। জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গে পণ্যদ্রব্যের দাম হঠাৎ বেড়েছে এমন নয়। মার্চেও খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৮৫ শতাংশ। তখনও এই হার ছিল দেশের সর্বোচ্চ। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মূল্যবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশেরও বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের বাজার আগুন। বাজার দর প্রতিদিনই মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। গত এক মাসে এ রাজ্যে খাদ্যপণ্যের দাম চড়া হারে বেড়েছে। কাঁচা-সবজির মূল্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেবে মূল্যবৃদ্ধির হার ২ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে থাকলে তা মোটামুটি সহনীয়। ৬ শতাংশ ছুঁলেই বিপদসীমা। ক্রেতা মূল্য সূচকের (সিপিআই) ভিত্তিতে সকল রাজ্যকে ছাপিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন শীর্ষে অবস্থান করছে।

# জ্ঞানবাপি মসজিদ সিল করার নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** গত ১৭ মে জ্ঞানবাপি মসজিদ মামলার শুনানিতে মসজিদ চত্বর সিল করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে জ্ঞানবাপি মসজিদে নামাজ পড়া চলবে বলে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। জ্ঞানবাপি মসজিদে মামলার শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ও পিএস নরসীমার ডিভিশন বেঞ্চে। মামলায় দাবি করা হয়, মসজিদের ভেতরে রয়েছে স্থানীয় মন্দিরের অংশ। এরপরই এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের নির্দেশে সর্বেক্ষণ সমীক্ষা ও মন্দিরের ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়। ১৬ মে জ্ঞানবাপি কূপ থেকে উদ্ধার হয় শিবলিঙ্গের একটি অংশ। মামলাকারীদের আইনজীবী দাবি করেন এটিই স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গ ভগবান বিশ্বেশ্বরের শিবলিঙ্গ। এরপরই মসজিদটিকে সিল করার নির্দেশ দেয় এলাহাবাদ হাই কোর্ট। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে যেখানে 'শিবলিঙ্গ' পাওয়া গিয়েছিল, সেই স্থানটি সিল করে রাখতে হবে। নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় আচরণ চলবে। জ্ঞানবাপি মসজিদ মামলার মামলাকারীদের আইনজীবী দাবি করেন, জ্ঞানবাপি কূপে উদ্ধার হওয়া জ্যোতির্লিঙ্গটি দীর্ঘসময় অপূজিত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর যথাযথ পুজোর অনুমতি দেওয়া হোক বলে শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

# ক্রিপ্টো নিয়ে সতর্কতা রিজার্ভ ব্যাংকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** ক্রিপ্টোকারেন্সির জেরে ভারতের অর্থনীতির একাংশের ডলারে নির্ভরশীলতা বাড়তে পারে, যা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে ভালো নয়। অর্থনীতি নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সামনে এই আশঙ্কাই প্রকাশ করলেন রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তারা। দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতার উপর এই ধরনের ইন্টারনেটে সহায়ক মুদ্রার বিরূপ প্রভাবের আশঙ্কা জানিয়েছেন শীর্ষ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস ও অন্য কর্তারা। তাঁদের মতে এর ফলে ঋণনীতি স্থির করতে সমস্যা হতে পারে। আগামীদিনে যার প্রভাব পড়বে আর্থিক লেনদেন নিয়ন্ত্রণে।

ক্রিপ্টো কারেন্সি নিয়ে এর আগেও বহুবার সতর্ক করেছে শীর্ষ ব্যাংক। গত বাজেটে তার

উপর করও বসিয়েছে অর্থমন্ত্রক। আরবিআই কর্তাদের মতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কালো টাকা লেনদেন, ড্রাগ কেনাবেচার মতো ঘটনায় ব্যবহার করা ছাড়াও দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠতে পারে এই পারে এই মুদ্রা। শীর্ষ ব্যাংক সতর্কতা জারি করে বলেছে, 'প্রায় সব ক্রিপ্টোই ডলারে লেনদেন হয় এবং বিদেশি সংস্থাগুলি এগুলো বাজারে ছাড়ে। ফলে অর্থনীতির একটা বড়ো অংশ ডলার নির্ভর (ডলারাইজেশন) হয়ে পড়তে পারে। যা ভারতের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী।'

বিশেষত সাধারণ মানুষ বেশি মুনাফার আশায় এখানে টাকা খাটালে এবং তার জেরে ব্যাংকে ঋণ দেওয়ায় তহবিলে টান পড়লে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা ধাক্কা খেতে পারে বলে জয়ন্ত সিন্হার নেতৃত্বাধীন সংসদীয় কমিটিকে জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক।

## ।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।।

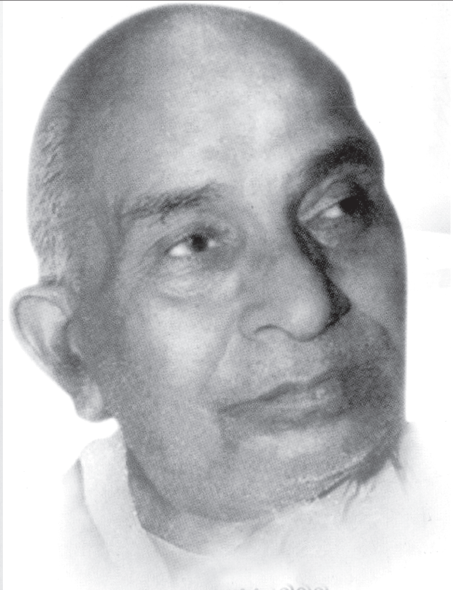

*সাধু, সন্ন্যাসীরা কোথায় থাকেন? পাহাড়ে, পর্বতে, নদীর তীরে? তাঁরা কি শুধু সারাদিন ধ্যান করেন? কখন খান? কখন ঘুমান? তাঁরাও কি স্কুলে কলেজে পড়াশুনা করেন?*

আগামী ৩০ মে থেকে এমনই একজন মহামানবের জীবনী প্রকাশিত হবে 'চিত্রকথা'র পাতায়— রেখায় লেখায় **মহানামব্রত**।


*With Best Compliments from -*

**A Well Wisher**



# যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ
(D.A.T.H.R.Y.)

**পাঠ্যসূচী ঃ** ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ, ও কুন্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাক্‌টিক্যাল (আসন - প্রাণায়াম - মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক - চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্‌টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বছর। ২৬শে জুন থেকে আরম্ভ।
যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।
ক্লাস ঃ প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট**
1977
**অব কালচার, যৌগিক কলেজ**

Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi, Govt. of India

কোর্স ফি ঃ ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা। ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

**ফর্ম ও প্রসপেক্টাস ঃ ১০০ টাকা**
**১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কল-২৯**
**9051721420 / 9830597884**